উপহার দিলাম।

লক্ষ্মীছাড়া

ও

অন্যান্য গল্প

অভিমানিনি, মণির বর, কথাকুঞ্জ, নববোধন

প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

ন্দনকাননের নবপর্য্যায়।

৷৷০ আট আনা সংস্করণ।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির ;
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।

সূচী।

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী ইলেক্‌ট্রো মেসিন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

লক্ষ্মীছাড়া
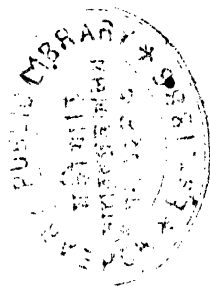
১

লক্ষ্মীছাড়া লোক অনেক থাকে বটে, কিন্তু ছিষ্টে সরকারের মত লক্ষ্মীছাড়া আর দুটী ছিল না। জন্মিবার মাস কতক পরেই সে মাকে খাইল; তিন বৎসর বয়সে বাপও মারা গেল। বিধবা পিসী মাতৃপিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে মানুষ করিতে লাগিল। কিন্তু ছিষ্টের অদৃষ্টদেবতার ইহাও সহ্য হইল না। কালের ডাকে পিসীও অনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। তখন ছিষ্টের বয়স সাত বৎসর মাত্র। উপরের এক জন ছাড়া তাহাকে দেখিবার আর কেহ রহিল না।

ছিষ্টের জেঠা ছিল, জেঠী ছিল। কিন্তু জেঠী নিজের সংসার, ছেলে-পিলে লইয়াই অস্থির। আর জেঠা গোবিন্দ সরকার লোকের মামলা মোকদ্দমার তদ্বির এবং হরিনামের মালা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং ছিষ্টেকে দেখিবার অবসর তাহাদের ছিল না। ছিষ্টে বামুনপাড়ার গরু চরাইয়া, বামুনদের পাতের ভাত খাইয়া মানুষ হইতে লাগিল।

ছিষ্টের বাপের লাখরাজে জমায় দশ বারো বিঘা জমী ছিল, খিড়কী পুকুরের অর্দ্ধেক অংশ ছিল। গোবিন্দ সরকার শুধু দায়ে পড়িয়াই ভ্রাতু-ষ্পুত্রের জমী জায়গার দেখা শোনা করিতে লাগিলেন। আর ছিষ্টেকে দেখিতে লাগিল, উপরওয়ালা।

এই অদৃশ্য উপরওয়ালার অযাচিত করুণার বলে ছিষ্টে যখন চৌদ্দ বৎসরে পড়িল, তখন জেঠা এক দিন তাহাকে ডাকিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "হাঁরে ছিষ্টে, আমার ভাইপো হ'য়ে তুই লোকের গরু চরিয়ে বেড়াবি, এটা কি ভাল দেখায় ?"

ছিষ্টে বলিল, "কি করি জেঠা, পেটের দায়।"

জেঠা বলিলেন, "পেটের দায় ব'লে কি যা নয় তাই করতে হবে ? তুই কি যে সে বংশের ছেলে। আমি থাক্‌তে তোর পেটের ভাতের ভাবনা কি ?"

ছিষ্টেরও তখন বামুনদের পান্তা ও পাতের ভাতে অরুচি জন্মিয়া গিয়াছিল। সুতরাং জেঠার কথায় সে হাতে চাঁদ পাইল। জেঠার আশ্রয়ে থাকিতেই স্বীকৃত হইল।

জেঠার ঘরে থাকিয়া ছিষ্টে গরম ভাতের মুখ দেখিতে পাইল বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সারাদিন মাঠে যে খাটুনী খাটিতে হইত, তাহাতে সে পান্তা ভাত ও গরম ভাতের মধ্যে কোন্‌টা তাহার পক্ষে অধিক সুখ-কর, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিত না। জেঠার চাষবাস ছিল, তিন চারিটী গরু ছিল। ছিষ্টে আসিবার পরই রাখালটা সেই যে চলিয়া গেল, আর আসিল না। জেঠা বলিলেন, "ওরে ছিষ্টে, গো-সেবা পরম ধর্ম্ম। বারো বৎসর গোয়াল পরিষ্কার করলে হাতে পদ্মগন্ধ হয়।" ধার্ম্মিক জেঠার আদেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছিষ্টেকে এই পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইল।

ছোট ছেলেটা তাহার এমনই নেওটা হইয়া পড়িয়াছিল যে, ছিষ্টের

কোল ছাড়া সে এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারিত না। একবার মাটীতে বসাইয়া দিলে চীৎকারে পাড়া মাথায় করিত। রোদনান্তে তাহার নাসানিঃসৃত জলধারা পরিষ্কার করিতে ছিষ্টের কাপড়ের খুঁট ভিজিয়া যাইত।

এইরূপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছিষ্টে এক দিন জেঠা মহাশয়ের নিকট গরম ভাত ও পান্তা ভাতের পার্থক্য বুঝিয়া লইতে গেলে, জেঠা শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "ওরে হতভাগা, সে যে পরের ভাত, লোকে বল্‌তো—অমুকের চাকর। আর এটা নিজের ভাত। তুই কি আমার অপর পর? আপনার ভাইপো যে।"

ছিষ্টেও বুঝিল, কথাটা মিথ্যা নয়। বাপ আর জেঠায় কি প্রভেদ আছে? সুতরাং সে দিনরাত খাটিয়া তুই বেলা তুই মুঠা ঘরের ভাত খাইতে লাগিল। আর জেঠা মামলায় এবং হরিনামে অধিকতর মনোযোগ দিবার অবকাশ পাইয়া হরিকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

মাস কতক পরে গোবিন্দ সরকার এক দিন ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপু ছিষ্টিধর, তোমার জমী-জায়গাগুলো পাঁচ ভূতে লুটে খাচ্চে, তার চেয়ে ওগুলো বেচে ফেল। ওর একটা বিলি বন্দেজ হোক্।"

ছিষ্টে জেঠার পরামর্শে সম্মতিদান করিল। বিপিন চক্রবর্ত্তী শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, "মর বেটা চাষা, জমী বেচবি কি দুঃখে?"

ছিষ্টে বলিল, "জেঠা বলেছে, ওগুলোর বিলি বন্দেজ হবে।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তোর সাত পুরুষের মাথা হবে। আমাকে কবুলতী ক'রে দে। বছর বছর খাজানা পাবি, জমী তোরই থাক্‌বে।"

ছিষ্টে গিয়া জেঠাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। জেঠা মালা জপিতেছিলেন। জপ বন্ধ রাখিয়া তিনি বলিলেন, "লোকের কথায় কাণ দিস্‌ নে বাবা, লোকে কি কারও ভাল দেখ্‌তে পারে? আমি আপনার লোক,

আমি তোর মন্দ করবো, আর পরে ভাল করবে? বলে—মার চেয়ে দরদী যে, তারে বলি ডান।”

সে দিন রাত্রিতে আহারকালে জেঠা আপনার পাতের মাছের মুড়াটা ভাইপোর পাতে তুলিয়া দিলেন। গৃহিণী প্রতিবাদের সুর তুলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে জেঠা স্নেহ-কোমল-কণ্ঠে বলিলেন, “আহা, থাক্। ও কি আমার পর? ও খেলেই আমার খাওয়া হ’লো।”

মাছের মুড়াটা যত মিষ্ট না হউক, জেঠার এই কথাগুলা ছিষ্টের এত মিষ্ট লাগিল যে, তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল।

পর দিন সকালেই গোবিন্দ সরকার ভাইপোকে লইয়া রামপুরের রেজেষ্ট্রী আফিসে গেলেন। ছিষ্টে জেঠার শিক্ষামত খাওয়া-পরার জন্য জমী বিক্রয় করিতেছে, ইহা রেজিষ্টারের সম্মুখে স্বীকার করিয়া টিপসই দিয়া জমীজায়গা বেচিয়া আসিল। আসিবার সময় জেঠা তাহাকে সাড়ে সাত আনা দিয়া একটা গেঞ্জী কিনিয়া দিলেন।

গ্রামের লোকে বলিল, ছোঁড়াটা কি লক্ষ্মীছাড়া!

২

“দিদি! ও দিদি!”

দিদি মুখ ঝামটা দিয়া উত্তর করিল, “কেন?”

ক্রুদ্ধভাবে ছিষ্টে বলিল, “কেন :আবার কি? আমি এলাম ভোর দুপুর খেটে, আর উনি ঘরে শুয়ে শুয়ে বলছেন কেন? বাঃ রে!”

কথাটা হইতেছিল, গোবিন্দ সরকারের বিধবা কন্যা বিধুমুখীর সঙ্গে। বিধবা হইয়া সে বাপের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল।

ছিষ্টে একটু অপেক্ষা করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিল, “তবু যে শুয়ে রইলে?”

বিধু বলিল, “উঠে কি কর্‌বো?”

ছিষ্টে বলিল, "ভাত দেবে, আর করবে কি ?"

বিধু মুখটা বালিশে গুঁজিয়া বলিল, "ভাত নাই।"

বিস্মিতকণ্ঠে ছিষ্টে বলিয়া উঠিল, "ভাত নাই !"

বিধু বলিল, "না। রাঁধা বাড়ার পর মামার বাড়ীর এক জন লোক এসেছিল। সে তোর ভাত খেয়ে গেছে।"

ছিষ্টে কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তার পর উগ্রকণ্ঠে বলিল, "বাঃ রে, ভাত খেয়ে গেছে, তা আমি খাব কি ?"

বিধু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল; তীব্রস্বরে বলিল, "আমার মাথা, খেতে পারবি ?"

বিধুর গলাটা যেন ভারী হইয়া আসিল। ঈষৎ হাসিয়া ছিষ্টে বলিল, "যে রকম পেটের জ্বালা ধরেছে, খেতে থাকলে তা খুব পারতাম দিদি।"

বিধু মুখ ফিরাইয়া লইয়া আঁচলে চোখ মুছিল। ছিষ্টে সহাস্যে বলিল, "তুমি যে কেঁদে ফেল্লে দিদি।"

বিধু ভ্রূকুটী করিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "বোয়ে গেছে আমার কাঁদ্‌তে। তোর মত লক্ষ্মীছাড়ার জন্য আবার মানুষে কাঁদে !"

ছিষ্টে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "সত্যি দিদি, তুমি ছাড়া আমার জন্যে আর কেউ কাঁদে না।"

বিধু কোনও উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। ছিষ্টে মাটীতে পা ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "তাই তো দিদি, মুড়ি-টুড়ি কিছু নাই ? উঠে দেখ না ?"

ধরা গলায় "আমি পারব না" বলিয়া বিধু আবার শুইয়া পড়িল। ছিষ্টে বলিল, "তবে কি উপোস দেব নাকি ?"

তীব্রকণ্ঠে বিধু বলিল, "তোর কপাল ! বেটাছেলে, হাত পা আছে, আর কোথাও এই খাটুনী খাট্‌লে তো দু'বেলা পেট ভ'রে খেয়ে বাঁচিস্।"

ছিষ্টে কোনও উত্তর দিল না ; শুধু দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

গৃহিণী আহারান্তে গালে দোক্তা ও কোলে ছেলে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বাড়ীতে ঢুকিলেন। ঢুকিয়াই ছিষ্টেকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে ছিষ্টে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? ছেলেটাতো কেঁদে কেঁদে সারা হ'য়ে গেল। নে একবার ধর্।"

ছিষ্টে করুণদৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে চাহিল। বিধু উঠিয়া বসিল, এবং মাতার দিকে রুক্ষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শ্লেষের স্বরে বলিল, "শুধু ছেলেটা দিচ্চ কেন মা, তুমি আছ, বাবাকে ডাক, আর কেউ থাকে, ডেকে নিয়ে এস। সকলে মিলে ছোঁড়াটার বুকে চেপে ব'সো।"

নাসা কুঞ্চিত করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "কেন বল্ দেখি বিদি, আজ কাল দেখছি তোর বড় কথা হ'য়েছে।"

বিধু উঠিয়া দাঁড়াইল ; তীব্রকণ্ঠে বলিল, "কথার মত কাজ কর্‌লেই কথা শুন্‌তে হয় না। তোমরা কি মানুষ ?"

গর্জ্জন করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "না, মানুষ শুধু তুমি। আচ্ছা আসুক বাড়ীতে ; আমার সঙ্গে সমানে কথা। খেংরা মেরে বিদেয় কর্‌বে তা জানিস্ ?"

মাতার মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কঠোরস্বরে বিধু বলিল, "তা তোমরা পার মা।"

বিধু জোরে জোরে পা ফেলিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।

হাঁড়ীতে এক মুঠা পান্তা ভাত ছিল। কতকটা আমানীর সহিত সেই ভাতগুলি একটা পাথরে বাড়িয়া বিধু ছিষ্টেকে ডাকিল। ছিষ্টে সহর্ষে উঠানে নামিয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল। এমন সময় সরকার মহাশয় সদর দরজা হইতে চীৎকার করিতে করিতে বাড়ীতে ঢুকিলেন— "বাবু গেলেন কোথায় ? গরুগুলো মাঠ থেকে এসে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে

রয়েছে যে। হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া, আমার সর্ব্বনাশ করবে দেখছি, গরুর শাপে যে সব যাবে ?"

গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "থাম, আগে নিজের পিণ্ডী দান হোক্। গরুর কি আবার ক্ষিদে তেষ্টা আছে ?"

ক্রুদ্ধভাবে সরকার মহাশয় বলিলেন, "ওগো বাবু, গরুগুলোকে এক মুঠো ঘাস জল দিয়ে এসে নিজের পিণ্ডী চট্‌কাও না। গরু যে সাক্ষাৎ মা ভগবতী, ভগবতীর নিঃশ্বেসে যে ভিটে উঠে যাবে।"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "তুমিও যেমন, ঐ তিন-কুল-খেকো লক্ষ্মীছাড়াকে আবার ঘরে ঠাঁই দেয়।"

রান্নাঘর হইতে বিধু ডাকিল, "ছিষ্টে !"

ছিষ্টে বলিল, "আগে গরুগুলোকে খাবার দিয়ে আসি, দিদি।"

ছিষ্টে চলিয়া গেল। "চুলোয় যা" বলিয়া বিধু ভাত আমানী পুনর্ব্বার হাঁড়ীতে ঢালিয়া রাখিয়া রাগে গর-গর করিতে করিতে ঘাটের দিকে চলিয়া গেল। গৃহিণী তাহার দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বিদির আজ কাল বড্ড বাড় বেড়েচে দেখচি।"

গম্ভীরস্বরে সরকার মহাশয় বলিলেন, "বাড়লেই পড়তে হয় গিন্নী, দর্পহারী মধুসূদন আছেন। তিনি কারও বাড় রাখেন না। হরি বল মন, হরি বল।"

৩

গোবিন্দ সরকারের মেয়ে বিধুর হৃদয়টা ঠিক বাপের মত ছিল না। দুঃখের প্রচণ্ড আঘাতে তাহা এতই কোমল হইয়া পড়িয়াছিল যে, দুঃখীর দুঃখে তাহা ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারিত না। সুতরাং ছিষ্টের জন্য তাহার প্রাণটা আপনা হইতেই কাঁদিয়া উঠিত। কিন্তু প্রতীকার করিবার উপায় তাহার ছিল না। তাহার ইচ্ছা, ছিষ্টে অন্যত্র খাটিয়া খাউক্।

কিন্তু ছিষ্টে তাহাতে সম্মত ছিল না। জেঠার বাড়ী ছাড়িয়া, দিদিকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে তাহার মন সরিত না। বিধু তাহাকে তিরস্কার করিত, গালাগালি দিত; ছিষ্টে হাসিমুখে নীরবে সে স্নেহ-কোমল তিরস্কার সহিয়া যাইত। এই তিরস্কার, এই গালাগালির ভিতর সে এমন একটা স্নেহের আস্বাদ অনুভব করিত যে, দুঃখময় জীবনে এই আস্বাদটাই তাহার লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু তাহার এই লোভনীয় জিনিসটুকুর জন্য দিদিকে যে কতটা নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত, তাহা ছিষ্টে জানিত না।

একদিন জানিতে পারিল। সে দিন ছিষ্টের পক্ষ অবলম্বন করায় বিধু মাতা পিতার নিকট অতি কঠোর ভাবে তিরস্কৃত হইল। রাগে অভিমানে বিধু সে দিন জলগ্রহণ করিল না। রাত্রে ছিষ্টে অনেক কাঁদাকাটা করিয়া, পায়ে হাতে ধরিয়া দিদিকে কিছু খাওয়াইল। সেইদিন ছিষ্টে দিদিকে বলিল, "তুমি আমার জন্যে কেন কথা কইতে যাও দিদি?"

বিধু বলিল, "বুঝতে পারি না। চোখের সাম্‌নে অন্যায় দেখলেই বল্‌তে হয়।"

ছিষ্টে একটু ভাবিয়া বলিল, "তা হ'লে দিদি, আমি আর তোমার চোখের সামনে থাক্‌ব না।"

বিধু জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবি?"

ছিষ্টে গর্ব্বে মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল, "কেন আমার কি আর যাবার জায়গা নাই? বেটা ছেলে হাত আছে, পা আছে, আমার আবার থাক্‌বার ভাবনা।"

তিরস্কারের স্বরে বিধু বলিল, "আর তোকে বাহাদুরি দেখাতে হবে না। সে ক্ষমতা থাক্‌লে তুই এখানে প'ড়ে লাথি ঝাঁটা খাস্ না, আমাকেও খাওয়াস্ না।"

ছিষ্টে বলিল, "আচ্ছা, ক্ষমতা আছে কি না দেখ।" ছিষ্টে গিয়া জেঠাকে আপনার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিল।

জেঠারও ইহাতে অসম্মতি ছিল না। বলিলেন, "তোমার যেখানে ইচ্ছা, যেতে পার। তুমি দু'বেলায় যা খাও, তার অর্দ্ধেক খরচে একটা লোক থাকবে! গরু বাছুরগুলোও খেয়ে বাঁচবে।"

ছিষ্টে বলিল, "কিন্তু আমার জমী জায়গাগুলো?"

জেঠা বলিলেন, "সে সব তো তুমি বেচে ফেলেছ।"

ছিষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, "বেচেছি তো, তার টাকা কোথায়?"

জেঠা বলিলেন, "টাকা কোথায়, তা আমি কি জানি?"

ছিষ্টে রাগিয়া বলিল, "তবে সব জুয়াচুরী!"

কি? পরম ধার্ম্মিক গোবিন্দ সরকার জুয়াচোর। জেঠা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে পায়ের জুতাটা খুলিয়া সজোরে ছিষ্টের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। জুতাটা গিয়া ছিষ্টের কপালে লাগিল। ছিষ্টে কপালটা টিপিয়া ধরিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

ছিষ্টে গিয়া বিপিন চক্রবর্ত্তীকে চাপিয়া ধরিল; বলিল, "বামুনকাকা, আমার যা হয় একটা উপায় করে দাও।"

বিপিন চক্রবর্ত্তীর সহিত গোবিন্দ সরকারের একটু বিবাদ ছিল। সরকার মহাশয় তাঁহার বিরুদ্ধে একটা মোকদ্দমার তদ্বির করিয়া প্রতিপক্ষকে জয়ী করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং বিপিন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার উপায় পাইয়া ছিষ্টেকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "উপায় তোমার ক'রে দিতে পারি, তুমি আমার কথামত চলবে?"

ছিষ্টে তাঁহার কথামত কাজ করিতে স্বীকার করিল। বিপিন বলিলেন, "বেশ, তোমার জমী জায়গা সব বা'র ক'রে দেব, তোমার বিয়ে দিয়ে তোমাকে স্থিতু করব।"

ছিষ্টে আশ্চর্য্যান্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে!"

বিপিন বলিলেন, "হাঁ; বিয়ে। শ্রীপতি ঘোষ মারা গেছে। তার বিধবা স্ত্রী আর একটী মেয়ে আছে। তাদের দেখবার শুন্‌বার কেউ নেই। তোমাকে ঘরজামাই হ'য়ে তাদের দেখা শোনা করতে হবে।"

ছিষ্টে শ্রীপতি ঘোষকেও জানিত, তাহার মেয়ে পুঁটীকেও জানিত। মেয়েটী দেখিতে বেশ। কিন্তু তাহার সহিত যে বিবাহ হইতে পারে, এ কথাটা ছিষ্টে আদৌ কল্পনা করিতে পারিত না। সুতরাং সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে?"

বিপিন বলিলেন, "আমি বল্‌লেই দেবে। কিন্তু বাপু, তোমার এ রকম লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে থাকলে চল্‌বে না, আগে জমী জায়গাগুলো উদ্ধার করতে হবে।"

ছিষ্টে বলিল, "আমি যে সব বেচে ফেলেছি।"

বিপিন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, বিষয় বিক্রয় করিলেও তাহা আইন-সিদ্ধ হয় নাই, কেন না, নাবালকের দান-বিক্রয়ে অধিকার নাই। মোকদ্দমা করিলেই সমস্ত বিষয় বাহির হইয়া আসিবে। ছিষ্টে মোকদ্দমা করিতে টাকা কোথায় পাইবে জিজ্ঞাসা করিলে বিপিন বলিলেন, "সে জন্য তোমার চিন্তা নাই। টাকা যা খরচ হয়, আমি দেব; কিন্তু বাপু এর পর খালধারের আড়াই বিঘা জমিটী আমায় দিতে হবে।"

ছিষ্টে জমী দিতে স্বীকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তত দিন আমি থাক্‌ব কোথায়? খাব কি?"

বিপিন বলিলেন, "তত দিন তোমার হবু শ্বশুরবাড়ীতেই থাক্‌বে, সেইখানেই খাবে দাবে।"

ছিষ্টে বামুনকাকার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

৪

বিধু রায়দীঘীতে গা ধুইয়া ফিরিতেছিল, ছিষ্টে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। বিধু জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে ছিষ্টে, তোর নাকি বিয়ে?"

ছিষ্টে বলিল, "হাঁ দিদি, বামুনকাকা আমার বিয়ে দিয়ে দেবে।"

বিধু বলিল, "তা বেশ, বামুনকাকার কথামত চল্‌বি। যা বলে, তাই শুন্‌বি।"

ছিষ্টে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা আর শুন্‌বো না দিদি, আমার বিয়ে হবে, জমী জায়গা সব ফিরে পাব। তবে কি জান্—"

বিধু জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি?"

ছিষ্টে বলিল, "আর কিছু নয়, তবে জেঠার সঙ্গে মোকদ্দমা—"

বিধু একটু বিরক্তভাবে বলিল, "তা হোক মকদ্দমা, আপনার গণ্ডা বুঝে নিতে গেলে ও সব কর্ত্তে হয়। খবরদার বলছি, বামুন কাকার কথার একটু এ-দিক ও-দিক করিস্ না। তা হ'লে তোর মুখ পর্য্যন্ত দেখবো না।"

ছিষ্টে বলিল, "না দিদি, তা কর্‌বো না। তা হ'লে তোমারও এতে মত আছে?"

বিধু বলিল, "খুব মত আছে।"

ছিষ্টে প্রস্থানোদ্যত হইল। বিধু ডাকিয়া বলিল, "হাঁরে ছিষ্টে?"

ছিষ্টে ফিরিয়া দাঁড়াইল। বিধু জিজ্ঞাসা করিল, "তোর হবু শাশুড়ী কেমন যত্ন করে রে?"

ছিষ্টে সহাস্যে উত্তর করিল, "তা খুব যত্ন করে। তবে তোমার মতন কি?"

ঈষৎ হাসিয়া বিধু বলিল, "আমার মত গাল দিতে পারে না বুঝি?"

ছিষ্টে বলিল, "গাল? তা দিদি, তোমার মত গাল যদি দেশশুদ্ধ লোক দেয়—"

ছিষ্টে হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া পায়ের বুড়া আঙ্গুল দিয়া মাটী খুঁড়িতে লাগিল। বিধু রাগতভাবে বলিল, "যা যা, আর তোর অত ন্যাকামো করতে হবে না।"

ছিষ্টে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিধু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে, বৌ তোর সামনে আসে? কথা টথা কয়?"

ছিষ্টে মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বিধু ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তা বিয়েটা হ'য়ে যাক্, তার পর এক দিন গিয়ে দেখে আসব।"

মুখ তুলিয়া ছিষ্টে বলিল, "বিয়ের সময় যাবে না?"

বিধু বলিল, "যাব না কেন। তুই নিয়ে যাবি ত?"

মুখ ভার করিয়া ছিষ্টে বলিল, "নাঃ।"

"আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে" বলিয়া বিধু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

৫

গোবিন্দ সরকার যখন শুনিলেন যে, ছিষ্টের জমী জায়গা ভোগ করার জন্য ছিষ্টে তিন বৎসরের জমীর আয় বাবদ তাঁহার নামে দুই শত তিয়াত্তর টাকার দাবীতে নালিশ রুজু করিয়াছে, তখন তিনি কয়েকবার শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া জবাব দিয়া আসিলেন যে, তিন বৎসর আগে তের শত তের সালের মাহ চৈত্রের সাত তারিখে সৃষ্টিধর সাত শত একচল্লিশ টাকা মূল্যে এই সকল জমী জায়গা তাঁহাকে বিক্রয় করিয়াছে, এবং সে বিক্রয়-কোবলা রেজিষ্টার সাহেবের দ্বারা রীতিমত রেজেষ্টারী হইয়াছে। এক্ষণে দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় ছিষ্টিধর তাঁহার নামে এই বে-আইনী নালিশ করিয়াছে।

ইহার জবাবে স্বষ্টিধর বলিল, প্রতিবাদীর কথিত তারিখে সে একখান বিক্রয়-কোবালা রেজেষ্টারী করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সে স্বেচ্ছায় করে নাই, বা সে জন্য তাহাকে এক পয়সাও দেওয়া হয় নাই। তাহার নাবালক অবস্থায় তাহাকে ভুলাইয়া এই দলীল লেখাইয়া লওয়া হইয়াছিল। সুতরাং প্রতিবাদীর দাখিলী এই বিক্রয়-কোবালা আইন অনুসারে সম্পূর্ণ অসিদ্ধ।

গোবিন্দ সরকার মোকদ্দায় ঘুণ। মোকদ্দমার তদ্বির করিয়া তিনি মাথার চুল সাদা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ মোকদ্দমায় তাঁহার পরাজয় নিশ্চিত। অধিকন্তু তাঁহাকে নাবালকের বিষয় ফাঁকি দিয়া লওয়ার অজুহাতে পড়িতে হইবে। উকীলও মোকদ্দমা মিটাইয়া লইবার পরামর্শ দিলেন। সরকার মহাশয় কিন্তু মিটাইবার মত কোনও উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। বিপিন চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ছিষ্টিধরের জমীর সঙ্গে গোবিন্দ সরকার যদি নিজের তিন বিঘা জমী ফিরাইয়া দেন, তবেই মোকদ্দমা মিটিতে পারে।" সরকার মহাশয় ছিষ্টিধরের অর্দ্ধেক বিষয় ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু বিপিন চক্রবর্ত্তী তাহাতে কাণ দিলেন না, হাসিয়া প্রস্তাবটা উড়াইয়া দিলেন। সরকার মহাশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

১৫ই অগ্রহায়ণ মোকদ্দমার দিন পড়িয়াছিল। বিশে অগ্রহায়ণ ছিষ্টের বিবাহের দিনস্থির হইল। ১৫ই মোকদ্দমা মিটিয়া গেলেই—মোকদ্দমায় যে ছিষ্টেই জয়ী হইবে, সে পক্ষে কাহারই সন্দেহ ছিল না—বিশে তারিখে বিবাহ হইয়া যাইবে। বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। ছিষ্টের উল্লাসের সীমা রহিল না। তাহার অত্যধিক উল্লাস দেখিয়া লোকে তাহাকে কত পরিহাস করিতে থাকিল। আর গোবিন্দ সরকার চিন্তাবিষে

জর্জ্জরিত হইয়া ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীহরিকে প্রাণপণে ডাকিতে লাগিলেন।

সেদিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সরকার মহাশয় মালা জপ করিলেন। জপ শেষ করিয়া যখন উঠিলেন, তখন তাঁহার মুখে প্রফুল্লতার চিহ্ন দেখিয়া গৃহিণী আশ্বস্তা হইলেন।

পর দিন সকালে ছিষ্টে জেঠার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া বাজারে যাইতেছিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে জেঠা ডাকিলেন, "বাবা ছিষ্টিধর!"

ছিষ্টে চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। জেঠার চেহারা দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। এই কয়দিনেই তিনি যেন আধখানা হইয়া গিয়াছেন। জেঠা ধীর কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "গোটাকতক কথা আছে বাবা।"

ছিষ্টে বিস্মিতভাবে জেঠার পশ্চাৎ বাড়ী ঢুকিল। সরকার মহাশয় তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়াই তাহার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ছিষ্টে বিস্মিত-স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সরকার মহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা ছিষ্টিধর, বুড়ো জেঠাকে মার্‌বি? এই বয়সে—"

ছিষ্টে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সরকার মহাশয় বাঁ হাতে চোখ মুছিয়া অশ্রুগদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, "এই বয়সে তুই আমাকে অপমান করাবি? আমার অপমানে কি তোর অপমান নয়? আমার গায়ের রক্ত, তোর গায়ের রক্ত কি আলাদা? তুই আমাকে দু'ঘা মারলেও সহ্য হবে, কিন্তু ঐ বামুনটাকে দিয়ে—ওহো হো!"

ছিষ্টের বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। মুখ নিচু করিয়া বলিল, "আমাকে কেন জুতো মার্‌লে?"

সরকার মহাশয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "রাগ চণ্ডাল বাবা, রাগ চণ্ডাল।"

ছিষ্টে নিরুত্তর। সরকার মহাশয় ধীর মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "আর যদিই মেরে থাকি। তোর বাপ যদি মার্‌তো, তার নামে কি নালিশ কর্‌তিস্? বাপ আর জেঠা কি আলাদা ছিষ্টিধর?"

লজ্জাজড়িতকণ্ঠে ছিষ্টে বলিল, "আমার অন্যায় হয়েছে জেঠা।"

জেঠা সহর্ষে বলিলেন, "তোর অন্যায় নয় বাবা, লোকে তোকে নাচিয়েছে। তা নইলে তুই কি আমার তেমন? কিন্তু বাবা, এই আমি বলে রাখছি, মোকদ্দমা শেষ হ'লেই আমি গলায় দড়ী দেব, জলে ঝাঁপ দেব। তোমাকে এর পাপের ভাগী হ'তে হবে।"

ছিষ্টের প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে ভয়ে বলিল, "আমি কি কর্‌বো?"

তখন সরকার মহাশয় তাহাকে বসাইয়া, এক্ষণে তাহার কি করা কর্ত্তব্য, তাহার বিস্তৃত উপদেশ দিলেন। উপদেশদানান্তে বলিলেন, "তুমি কি মনে কর বাবা, আমি তোমার বিষয় ফাঁকি দিয়ে নেব? রাধে মাধব, রাধে মাধব! আমি কি এতটা পাষণ্ড! পাছে ছেলেমানুষ পেয়ে কেউ বিষয়টা ফাঁকি দিয়ে নেয়, তাই ওটাকে হাত ক'রে রেখেছি। আমি সব ফিরিয়ে দেব, কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করে ফিরিয়ে দেব। তোমার বিষয় আমি নেব? হরি হরি!"

ছিষ্টে ম্লানমুখে বলিল, "কিন্তু বামুনকাকা যে আমার বিয়ে দেবে?"

সদম্ভে সরকার মহাশয় বলিলেন, "বিয়ে? আজ যদি মনে করি, কাল তোর তিন গণ্ডা বিয়ে দিতে পারি। নয় তো আমার নাম গোবিন্দ সরকারই নয়।

ছিষ্টে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সরকার মহাশয় বলিলেন, "তোর

যদি রাগ থাকে, তুই আমাকে দু' ঘা মার, কিন্তু বাবা বিপিন চক্রবর্ত্তীকে দিয়ে আমার অপমানটা করাস্ নি।"

সরকার মহাশয়ের দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারা গড়াইতে লাগিল। ছিষ্টে উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বিধু স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। সে ছিষ্টেকে বাড়ীর বাহির হইতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "ছিষ্টে!"

ছিষ্টে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না, মাথা নিচু করিয়া আপন মনে চলিয়া গেল।

আদালতে মোকদ্দমা উঠিলে ছিষ্টে হাকিমের সমক্ষে দাঁড়াইয়া বলিল, "হুজুর, আমি স্বেচ্ছায় জেঠাকে বিষয় বিক্রী করেছি। পাঁচ জনের কথায় আমি মিথ্যা নালিশ ক'রেছিলাম, এখন আর আমি মোকদ্দমা চালাতে চাই না।"

আদালত শুদ্ধ লোক হাঁ করিয়া ছিষ্টের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হাকিম মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিলেন।

৬

সন্ধ্যার পর গোবিন্দ সরকার মালা হাতে প্রফুল্লচিত্তে গৃহিণীর সহিত গল্প করিতেছিলেন, এমন সময় ছিষ্টে বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিল, "জেঠা!"

জেঠা উত্তর দিলেন, "কে?"

ছিষ্টে বলিল, "আমি ছিষ্টিধর।"

জেঠা গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কি?"

ছিষ্টে জেঠার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আমাকে ওখানে আর থাকতে দেবে না।"

জেঠা রুক্ষকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "তোমার মত লক্ষ্মীছাড়াকে কে ঠাঁই দেবে বল। তুমি একটা আস্ত কাল-সাপ। আমাকে সর্ব্বস্বান্ত

কর্‌তে বসেছিলে। কেবল ধর্ম্মই আমাকে রক্ষা করেছেন। হরি হে দীনবন্ধু!"

ছিষ্টে স্তম্ভিতভাবে উঠানে দাঁড়াইয়া রহিল। গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "কাল জেঠার নামে নালিশ ক'রে আজ আবার সম্পর্ক পাতাতে এসেছেন। লক্ষ্মীছাড়া হ'লে তার কি লজ্জা থাকে না গা?"

গৃহিণী উঠিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জেঠা মুখ ফিরাইয়া লইয়া ঘন ঘন মালা ঘুরাইতে লাগিলেন।

ছিষ্টে অন্ধকারময় উঠানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইল। বিধু রান্নাঘরের দাবায় দাঁড়াইয়াছিল। ছিষ্টে তাহার সম্মুখে গিয়া ডাকিল, "দিদি!"

রোষগম্ভীরস্বরে বিধু উত্তর দিল, "কেন?"

ছিষ্টে বলিল, "সারাদিন খাওয়া হয়নি দিদি, কিছু আছে?"

বিধু গর্জ্জন করিয়া বলিল, "উনানের ছাই আছে। খাবি?"

ছিষ্টে দাঁড়াইয়া মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল। বিধু উচ্চকণ্ঠে বলিল, "হতভাগা—লক্ষ্মীছাড়া, আমি তোকে খাবার দেব? দূর হ'য়ে যা বল্‌ছি আমার সাম্‌নে থেকে!"

ছিষ্টে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তার পর একবার দিদির মুখের উপর কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে সন্ধ্যার স্তব্ধ অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। বিধু দাঁতে দাঁতে চাপিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা যেন বিধুর চমক ভাঙ্গিল; সে ছুটিয়া গিয়া সদর দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, "ছিষ্টে, ছিষ্টে!"

কোনও উত্তর আসিল না। বিধু আবার চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ছিষ্টে, ওরে ছিষ্টে!"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে সরকার মহাশয় বলিলেন, "সে লক্ষ্মীছাড়া চুলোয় গেছে এখন তুই তার সঙ্গে যাবি ?"

বিধু দুই হাতে সদর দরজা চাপিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সরকার মহাশয় জপান্তে মালাছড়াটা গলায় ফেলিয়া ভক্তিগদগদকণ্ঠে পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।"
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে॥"

পূজার কাপড়

১

দুখের মা বারো বছরের ছেলে দুখীরামকে কিছুতেই আপনার দৈন্য বুঝাইতে না পারিয়া প্রমাদ গণিল।

তখন চারি দিকে পূজার ঢাক বাজিয়া উঠিয়াছে; ছেলের দল নূতন কাপড় পরিয়া নাচিতে নাচিতে ঠাকুর দেখিতে ছুটিয়াছে; ভিখারী দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া খঞ্জনীর তালে তালে গায়িতেছে,—

"গা তোলো গা তোলো বাঁধো মা কুন্তলো,
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী।"

এমনই সময়ে বাগ্দীর ছেলে দুখীরাম বিধবা মাকে ধরিয়া বসিল, "আমার নতুন কাপড় চাই।"

মা ধান ভানিয়া গোবর কুড়াইয়া, দিন চালাইত। কাপড় ছিঁড়িলে কায়েত পাড়া হইতে গৃহস্থের পরিত্যক্ত ছেঁড়া কাপড় চাহিয়া আনিয়া, শেলাই করিয়া আপনি পরিত, ছেলেকে পরিতে দিত। সুতরাং ছেলেকে

নূতন কাপড় কিনিয়া দিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। কিন্তু অবোধ আদুরে ছেলে মাতার অক্ষমতা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। গ্রামের প্রায় সকল ছেলেই নূতন কাপড় পরিয়াছে। দীনু খোড়্যের ছেলেরা নূতন কাপড় দেখাইয়া দেখাইয়া, হাততালি দিয়া, তাহাকে উপহাস করিয়াছে। সুতরাং সে ভাত খাইতে বসিয়া গোঁ ধরিল, "আমার নূতন কাপড় চাই। নয় তো ভাত খাব না।"

মা ছেলেকে অনেক বুঝাইল; বলিল, "ছি বাবা, পেটে খেতে পাই না, কাপড় কিনিতে পয়সা কোথায় পাব?"

দুখীরাম জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা আমি শুন্‌বো না, আমার কাপড় চাই। কেন, পটলাকে বেচলে তো পয়সা হয়?"

মা তাড়াতাড়ি দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিল, "ছি বাবা, অমন কথা বল্‌তে আছে? ও যে বাবা পঞ্চানন্দের পাঁঠা। সে বছর কি তুই ছিলি? কেবল বাবাই দয়া করে, ফেলে গেছেন। ও বাবার মানসিক।"

দুখীরাম বলিল, "হোক মানসিক, তুই ওকে বেচে কাপড় কিনে দে।"

মা কিছুতেই পটলাকে বেচিতে সম্মত হইল না। দুখীরাম তখন পঞ্চানন্দের উদ্দেশে কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া থালার ভাতগুলাকে উঠানময় ছড়াইয়া দিল। ভাতের জন্য না হউক, ঠাকুরের উপর কটূক্তি প্রয়োগ করায় মা না রাগিয়া থাকিতে পারিল না; সে "হতভাগা ছেলে" বলিয়া ছেলের পিঠে একটা চড় বসাইয়া দিল। ছেলে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া পলাইল। মা তখন একটি একটি করিয়া উঠানের ভাত খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁ হাতে ছেঁড়া কাপড়ে আঁচলটা টানিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল।

হায়! অনেক দুঃখের ছেলে দুখীরাম। যে দিন দুখীরাম জন্মিয়াছিল, সে দিন কি আনন্দ! মিন্‌সের মুখে কি হাসি! সেই ছেলে আজ

একখানা কাপড়ের জন্য মার খাইল? আজ যদি মিন্‌সে থাকৃত? তাহার চাকরী-বাকুরী ছিল না, জমীজমাও ছিল না, তবু গতরের মেহনতে সে যাহা আনিত, তাহাতে ছেলে কত নূতন কাপড় পরিত! তাহা হইলে আজ কি দুখীরামকে ভাত খাইতে বসিয়া চড় খাইতে হইত, না এত দুঃখের ছেলের এই করুণ চীৎকার তাহার বুকে শেল বিদ্ধ করিত! দুখের মা যত চোখের জল মুছিতে লাগিল, ততই কোথা হইতে চোখের কোলে জল আসিয়া জমিতে লাগিল। আঁচল ভিজিয়া গেল, কিন্তু সে জলস্রোত আর থামিল না।

হায় মা, আনন্দময়ী তুই; তোর আগমনে দুখের মার মত কত মাকে চোখের জল মুছিতে হয়! কেন?

২

সে দিন বিকালে রামজীবন দত্তের গোমস্তা শিবু আকুলি আসিয়া ডাকিলেন, "দুখের মা, ও দুখের মা।"

দুখের মা তখন কুটিরের পশ্চাতে এক গাদা গোবর লইয়া ঘুঁটে দিতেছিল। সে গোবরমাখা হাতে ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলটা তাড়াতাড়ি মাথায় তুলিয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া বলিল, "কেনে গা বাবাঠাকুর!"

আকুলি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর না একটা কালো পাঁঠা আছে?"

দুখের মা একটু থতমত খাইয়া উত্তর করিল, "পাঁঠা? একটা পাঁঠা আছে বাবাঠাকুর, কিন্তু—"

আকুলি মহাশয় একটু চড়া গলায় বলিলেন, "কিন্তু-মিন্তু নয়, পাঁঠাটা চাই। আমাদের সন্ধিপূজার কালো পাঁঠা পাওয়া যাচ্ছে না। কৈ পাঁঠাটা কোথায়?"

আকুলি মহাশয় ইতস্ততঃ ব্যগ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

পাঁঠাটী তখন অদূরে আশস্যাওড়ার বনের ধারে দাঁড়াইয়া বুনোগাছের পাতা চিবাইতেছিল। আকুলি মহাশয়ের সঙ্গে চাকর দামু আসিয়াছিল। সে সেই দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ বুঝি?"

আকুলি মহাশয় নধরকান্তি ছাগনন্দনের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "বেশ পাঁঠা, বলির যোগ্য বটে। ধ'রে নিয়ে আয় দামু!"

দামু পাঁঠা ধরিতে চলিল। দুখের মা আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, "না বাবাঠাকুর, ও বাবা পঞ্চানন্দের পাঁঠা, আমার দুখীর মানসিকী ওকে আমি বেচতে পার্‌ব না।"

মৃদু হাসিয়া আকুলি মহাশয় বলিলেন, "দূর বেটি, এত বড় পাঁঠা পঞ্চানন্দকে দেয়? এর দামে তিনটে পাঁঠা হবে। সিকে পাঁচেক হ'লেই মানসিকী শোধের মত একটা পাঁঠা পাওয়া যাবে। বাকী টাকায় তোর দুখেকে কাপড় কিনে দিতে পার্‌বি।"

দুখের মার বুকটা যেন একটু কাঁপিয়া উঠিল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

দামু পাঁঠা ধরিয়া আনিলে আকুলি মহাশয় তাহার সর্ব্বশরীর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, কোথাও একটু সাদা বা লালের দাগ পর্য্যন্ত নাই। তিনি হৃষ্টচিত্তে পাঁঠার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত নিবি দুখের মা?"

দুঃখের মার মুখে কোনও কথা নাই। সে তখন কোন্ দিক্ রক্ষা করিবে, তাহাই ভাবিতেছিল। এক দিকে ঠাকুরের কোপ, অন্য দিকে ছেলের আব্দার। ছেলে কোলের ভাত ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গিয়াছে। কোথায় ঘুরিতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। যে রকম একগুঁয়ে ছেলে,

তাহাতে কাপড় না পাইলে সে যে শান্ত হইবে, বা কিছু মুখে দিবে, এমন ত বোধ হয় না, কিন্তু অন্য দিকে—ঠাকুর। সত্যই কি কম দামের আর একটা পাঁঠা কিনিয়া দিলে ঠাকুর সন্তুষ্ট হইবেন?

দুখের মার কোনও উত্তর না পাইয়া আকুলি মহাশয় দামুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি রে দামু, কত দাম হ'তে পারে?"

দামু পাঁঠাটাকে একবার শূন্যে তুলিয়া তাহার মাংসের গুরুত্বের পরিমাণ অনুমান করিয়া লইল; তার পর মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল, "কত আর হবে? জোর সিকে এগারো।"

আকুলি মহাশয় সহাস্যমুখে বলিলেন, "তাই বটে, তবে দূর হোক্, পূজোর বাজার, আর ভাঙ্গা ভর্ত্তিতে কাজ নাই। তিন টাকাই হ'লো। গরীব মানুষ!"

বাস্তবিক, গরীব বলিয়া চার আনা বেশী স্বীকার করিবার পাত্র আকুলি মহাশয় ছিলেন না। পাঁঠাটার দর পাঁচ টাকার কম হইতে পারে না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে চার আনা দর বাড়াইয়া তিনি গরীবের উপর সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ছাড়িলেন না। এরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তিনি প্রায়ই অনেক গরীবকেই অনুগৃহীত করিয়া থাকেন।

দুখের মার কিন্তু দরের দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে শুধু পঞ্চানন্দের কোপ, আর ছেলের রাগের কথাই ভাবিতেছিল। সুতরাং পাঁচ টাকার পাঁঠার তিন টাকা দর শুনিয়াও সে কোনও প্রতিবাদ করিল না। আকুলি মহাশয় তখন পাঁঠাটাকে বাঁধিয়া লইতে হুকুম দিয়া দুখের মাকে বলিলেন, "কাল এক সময় গিয়ে দামটা চুকিয়ে নিয়ে আসিস্।"

দামু আপনার গামছা দিয়া পাঁঠাটাকে বাঁধিল। দুখের মা সহসা ছুটিয়া আসিয়া গোবর-মাখা হাতে আকুলি মহাশয়ের পা দুইটা জড়াইয়া

ধরিল; ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "দোহাই বাবাঠাকুর, আমাকে বাবার কোপে ফেলো না।"

আকুলি মহাশয় তাহার হাত হইতে পা ছিনাইয়া লইলেন, এবং গাছের পাতা ছিঁড়িয়া পায়ের গোবর মুছিতে মুছিতে বিকৃতমুখে বলিলেন, "মর্ বেটী, বাবার আবার কোপ কিসের? এই পাঁঠাটাই বাবাকে দিতে হবে, এমন কোনও লেখাপড়া আছে? এটা যদি হঠাৎ মারা যায়?"

দুখের মা শঙ্কিতদৃষ্টিতে আকুলি মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আকুলি মহাশয় গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তোর কোন ভয় নাই। আমি বামুন, ব্যবস্থা দিচ্চি, সিকে পাঁচেক দিয়ে একটা ছোট পাঁঠা কিনে মানসিক শোধ কর্‌বি। মানসিক শোধের সময় আমাকে খবর দিতে ভুলিস্ নি, বুঝলি?"

আকুলি মহাশয় অগ্রসর হইলেন। দামু পাঁঠাটাকে টানিতে টানিতে তাঁহার পশ্চাৎ চলিল। দুখের মা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

যখন ছেলে আসিয়া ডাকিল, তখন তাহার চৈতন্য হইল। দুখীরাম জিজ্ঞাসা করিল, "পটলাকে বেচেছিস্ মা?"

মা কোনও উত্তর দিল না, শুধু স্নিগ্ধদৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাহিল। দুখীরাম প্রফুল্লমুখে বলিল, "আমাকে কাপড় কিনে দিবি?"

মা সে কথায় কোনও উত্তর না দিয়া বলিল, "চল, এখন ভাত খাবি আয়!"

৩

পর দিন বৈকালে দুখের মা দত্তবাবুদের বাড়ীতে গিয়া আকুলি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিল। আকুলি মহাশয় তখন গয়লা, জেলে, ময়রা

প্রভৃতির বায়না লইয়া বড় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি দুখের মার দিকে চাহিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, "তোর যে আর হাড়ী চড়ে না দেখছি। তাড়াতাড়ি দাম আদায় করতে এসেছিস্।"

দুখের মা কোনও উত্তর না দিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। আকুলি মহাশয় অন্যান্য গোলযোগ কতক মিটাইয়া তাহার হিসাব দেখিতে বসিলেন। দুই তিনখানা খাতা উল্টাইয়া আঁক কষিয়া বলিলেন, "পাঁঠাটার দাম তিন টাকা না? তা তোর গেল সনের ভিটের খাজনা দশ আনা বাকী। তা গেল সনের দশ আনা আর হাল সনের দেড় টাকা, হ'লে দু' টাকা দু' আনা; সুদ চার আনা আট গণ্ডা। মোট দু' টাকা ছ' আনা আট গণ্ডা। আর পার্ব্বণী চার আনা, নগদীর রোজ দু' আনা, তা হলে দু' টাকা বার আনা আট গণ্ডা। যাক্, দু'কড়া ছেড়ে দিলাম, সাড়ে সাত গণ্ডা। তিন টাকার দু' টাকা বার আনা সাড়ে সাত গণ্ডা বাদ গেলে থাকে তিন আনা সাড়ে বার গণ্ডা, তা হ'লে সাড়ে চোদ্দ পয়সা। বুঝলি?"

না বুঝিলেও দুখের মা ঘাড় নাড়িল। তখন আকুলি মহাশয় বাক্স হইতে সাড়ে চোদ্দ পয়সা বাহির করিলেন, এবং দুইবার গণিয়া তাহা দুখের মার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। দুখের মা কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "বাবাঠাকুর, মোটে সাড়ে চোদ্দটি পয়সা?"

আকুলি মহাশয় ধমক দিয়া বলিলেন, "যা যা মাগী, এখন কাজের সময় বকাস্ নি; (গয়লাকে লক্ষ্য করিয়া) তার পর কি বলছিলে হে ঘোষের পো, সাড়ে আট টাকা ক'রে দই? কেন, তোমাদের দই দুধও যুদ্ধে যাচ্চে নাকি?"

দুখের মা পয়সা কয়টী কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

ঘরে না ঢুকিতেই দুখীরাম ছুটিয়া আসিয়া মায়ের আঁচল ধরিল; ব্যগ্র—উৎফুল্লকণ্ঠে বলিল, "কৈ দেখি, কেমন কাপড় ?"

মা কোনও উত্তর দিতে পারিল না; তাহার চোখ দুইটা তখন জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। দুখীরাম কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিল না; মা আসিবার সময় কেনপোলেদের দোকান হইতে কাপড় কিনিয়া আনে নাই, তজ্জন্য মাতাকে তিরস্কার করিল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দোকানে যাইবার জন্য মায়ের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। শেষে মা যখন অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে তাহাকে আকুলি মহাশয়ের প্রদত্ত পয়সার পরিমাণ বুঝাইয়া দিল, তখন দুখীরাম রাগে আগুন হইয়া বলিল, "কি আমার পটলাও গেল, কাপড়ও হ'লো না ? আমি পটলাকে ফিরিয়ে আনব।"

মা বলিল, "তারা কিনে নিয়ে গেছে, আর কেন ফিরিয়ে দেবে ?"

দুখীরাম জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তার বাবা দেবে। আমি আমার পাঁঠা ফিরিয়ে আনব, দেখি সে বেটা বামুন—"

মা তাড়াতাড়ি ছেলের মুখ চাপিয়া ধরিয়া, ব্যস্তভাবে বলিল, "ছি বাবা, বামুনকে কি গাল দিতে আছে ? বামুন দেবতা।"

দুখীরাম কিন্তু এমন প্রতারক ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া মানিতে চাহিল না। সে আকুলি মহাশয়ের উদ্দেশে যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিতে লাগিল। মা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "রক্ষে কর্ দুখে, যদি বাঁচতে চাস্ ত বামুনকে আর গাল দিস্ নি।"

দুখীরাম দৃঢ়স্বরে বলিল, "বাঁচি আর মরি, আমি হয় কাপড় চাই, নয় পটলাকে চাই। আমি পটলাকে কত ভালবাসি—তা জানিস্ ?"

মা শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

৪

ষষ্ঠীর দিন দত্তবাড়ীর লোক জন যখন এক দিকে কল্পারম্ভের, অন্য দিকে ঠাকুর সাজান, মেরাপ বাঁধা, বাজার করা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, তখন দুখীরাম ধীরে ধীরে গিয়া, বাহিরে যেখানে পাঁচ ছয়টা পাঁঠা বদ্ধ-অবস্থায় তৃণভক্ষণে নিরত ছিল, সেই খানে দাঁড়াইল। পটলাও সেখানে ছিল। দুখীরামকে দেখিয়া পটলা সকরুণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া অব্যক্ত শব্দ করিতে লাগিল। দুখীরাম তাহার গায়ে হাত বুলাইল, তাহার মাথাটা জড়াইয়া ধরিয়া বুকের উপর রাখিল। তার পর ইতস্ততঃ সতর্ক-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে তাহার গলার বাঁধন খুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল। পটলা কূর্দ্দন করিতে করিতে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

দামু বাজার করিয়া ফিরিতেছিল; সে "পাঁঠা-চোর, পাঁঠা-চোর!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বাড়ীর ভিতর হইতে লোক জন ছুটিয়া বাহিরে আসিল। দুখীরাম ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। কিন্তু সে অধিক দূর যাইতে পারিল না, একটা নালা ডিঙ্গাইতে গিয়া আছাড় খাইল। পাঁচ সাত জন আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। পটলা কিন্তু ধরা পরিল না, সে পাশের জঙ্গলে ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কয়েক জন লোক তাহার অনুসরণ করিল।

পূজক তখন কল্পারম্ভের পূজা শেষ করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। দত্তজা ক্ষৌমবস্ত্রে বিশাল বপু আবৃত করিয়া ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে দেবীমাহাত্ম্য শুনিতেছিলেন, আর মাঝে মাঝে ভৃত্যদিগকে নিম্নস্বরে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতেছিলেন। এমন সময় চাকরেরা পাঁঠা-চোরকে ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং সে কিরূপে নবক্রীত সন্ধিপূজার পাঁঠাটা চুরি করিয়া পলাইতেছিল, দামু তাহা সালঙ্কারে বিবৃত করিল। পূজকের চণ্ডীপাঠ থামিয়া গেল। দত্তজা ক্রোধ-রক্তদৃষ্টিতে চোরের দিকে চাহিলেন। দুখীরাম

কিন্তু তাহাতে একটুও ভীত হইল না; সে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া তীব্র সতেজ কণ্ঠে বলিল, "তোমরা বুঝি ফাঁকি দিয়ে পটলাকে নেবে? আমার হয় কাপড় চাই, নয় পটলাকে চাই।"

উত্তর শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। বাগ্দীর ছেলের মুখে এত বড় তেজের কথা শুনিয়া দত্তজা রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন; ক্রোধকম্পিত-কণ্ঠে আদেশ দিলেন, "বেটা বিছুটীর ঝাড়; জুতিয়ে বেটার মুখ ছিঁড়ে দাও।"

আদেশমাত্র সেই দ্বাদশবর্ষীয় বালকের পৃষ্ঠে পটাপট্ শব্দে জুতা, কিল, চড় পড়িতে লাগিল। যখন প্রহারের নিবৃত্তি হইল, তখন দুখীরাম অর্দ্ধমৃত। প্রতিবেশী দীনু খোড়ুই তাহাকে ধরিয়া তাহার ঘরে লইয়া গেল। পুরোহিত মহাশয় পুনরায় আচমন করিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি উদাত্ত স্বরে পড়িতে লাগিলেন,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

দত্তজার চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় ভক্তির নির্ঝর বহিতে লাগিল!

৫

মা ডাকিল, "দুখী, ও বাবা দুখীরাম!"

দুখীরাম রক্তচক্ষু উন্মীলিত করিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। মা জিজ্ঞাসা করিল, "অমন কচ্চিস্ কেন বাবা? কিছু খাবি?"

দুখীরাম নিরুত্তর। মা তাহার মুখে মুখ দিয়া কাতরস্বরে বলিল, "কাল সারা দিন রাত যে একটু কাঁচা জলও তোর পেটে যায় নি! কিছু খাবি?"

দুখীরাম বলিল, "খাব।"

মা তাড়াতাড়ি একটা থালায় ফেনভাত আনিয়া দিল। দুখীরাম উঠিয়া খাইতে বসিল, কিন্তু খাইতে পারিল না; এক গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়াই শুইয়া পড়িল। মা তাহার হাত ধুইয়া দিল, মাথার কাছে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

দত্তবাবুদের বাড়ীতে সপ্তমীপূজার বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিল। দুখীরাম ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল; চীৎকার করিয়া বলিল, "ঐ পটলাকে কাট্‌লে! কৈ, আমার নূতন কাপড় কোথায়?"

মা তাহাকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিল। দুখীরামের মাথা মায়ের কোলে লুটাইয়া পড়িল।

দীনু খড়ুই আসিয়া বলিল, "দেখছিস্‌ কি মাগী, বিকার হয়েছে, ডাক্তার ডাক্।"

দুখের মা আস্তে ব্যস্তে দত্তবাবুদের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারকে ডাকিতে ছুটিল। ডাক্তার বাবু কিন্তু আসিলেন না; বলিলেন, "এখনি আমাকে বাবুদের বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখতে যেতে হবে।"

না আসিলেও তিনি ঔষধ দিলেন। বলিলেন, "এই ওষুধটা নিয়ে যা, তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবি।"

দুখের মা একবার ছেলেকে দেখিয়া আসিবার জন্য কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। ডাক্তার রাগিয়া বলিলেন, "ভিজিট দিতে পার্‌বি?"

দুখের মার সে সংস্থান ছিল না। থাকিলে ভিজিটের টাকা দিয়া সে ছেলেকে কাপড় কিনিয়া দিত, ছেলেকে আজ ঔষধ খাইতে হইত না। দুখের মা ব্যথিতচিত্তে শুধু ঔষধ লইয়াই ফিরিল। ফিরিবার পথে সে ঘোষপুকুরের পাড়ে পঞ্চানন্দের গাছতলায় মাথা কুটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দোহাই বাবা, আমার অপরাধ হ'য়ে থাকে, আমায় নাও, আমার

দুখীকে বাঁচাও। আমি ভিক্ষে ক'রে ডাইনে বাঁয়ে পাঁঠা দিয়ে তোমার পূজো দেব।"

ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া ফিরিতেই সহসা দুখের মা দেখিল, পুকুরধারে পটলা চরিতেছে। এই যে এখানে পাঁঠা, আর বাবুদের লোক জন আজ দুই দিন পাঁঠা খুঁজিয়া হায়রাণ হইতেছে। দিনে সাতবার তাহার ঘরে খানাতল্লাসী করিতে আসিতেছে, তাহাকে কত ভয়, কত লোভ দেখাইতেছে। সে যেন পাঁঠাটাকে বেচিয়া আবার তাহাকে ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছে। ছি ছি, লোকের কি অশুদ্ধ মন!

পটলাকে ডাকিতেই পটলা মুখ তুলিয়া চাহিল এবং ধীরে ধীরে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। দুখের মা বাঁ হাতে ওষুধের শিশিটা ধরিয়া ডান হাতটা তাহার গায়ে বুলাইতে লাগিল। তার পর আঁচলের খুঁটে কোনরূপে তাহাকে বাঁধিয়া দত্তবাবুদের বাড়ীর দিকে চলিল।

যাইতে যাইতে সহসা তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার বুকের ভিতর বসিয়া বলিতেছে, "ও দুখের মা, করিস্ কি? এ যে বাবার পাঁঠা, বাবাই তাহাকে লোকচক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছেন। নয় ত এত লোকের চক্ষু এড়াইয়া সে কি এখানে বেড়াইতে পারে? তুই কি না আবার সেই পাঁঠা ধরিয়া বাবুদের বাড়ী দিতে চলিয়াছিস্? তোর কি ভাল হইবে? একবার ত পাঁঠা বেচায় তোর ছেলে এমন শাস্তি পাইল, ইহার উপর তুই নিজে উহাকে ধরিয়া দিয়া আসিলে কি তোর দুখে বাঁচিবে?"

দুখের মার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল। সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়-দৃষ্টিতে পশ্চাতে চাহিল। দেখিল, বাবার অধিষ্ঠিত বৃহৎ অশ্বত্থ গাছটা যেন নীরব নিথর ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তলদেশে সিন্দূরমণ্ডিত ঘটের উপর বসিয়া কে এক রুদ্রমূর্ত্তি পুরুষ হস্তসঙ্কেতে

তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিতেছে, "সাবধান দুখের মা, আমার মানসিকী পাঁঠা ফিরিয়ে দিলে তোর ভাল হবে না।"

দুখের মা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। হায় বাবা, অভাগী আমি, তোমার মানসিকী পাঁঠা যে বেচিয়া ফেলিয়াছি। স্বেচ্ছায় না হউক, অনিচ্ছাসত্বেও ছেলের আব্দার রাখিতে বেচিয়াছি, বেচিয়া দাম লইয়াছি। এখন ইহাকে দেখিয়াও ফিরাইয়া দিয়া না আসিলে কি অধর্ম্ম হইবে না? ক্রেতাকে কি ফাঁকি দেওয়া হইবে না? কিন্তু বাবার কোপে যদি—

দুখের মার বুকটা বড় জোরে কাঁপিতে লাগিল। সে ভাবিল, "দূর হোক্, নিজে একে ধ'রে দিয়ে আস্‌ব না, বাবুদের বাড়ীতে খবর দিই, তারা এসে ধ'রে নিয়ে যাক্। কিন্তু ততক্ষণে পাঁঠাটা যদি আর কোথাও চলিয়া যায়?"

দুখের মা কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

তা দুখের মার যদি একটুও বিচারশক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে অনায়াসেই বুঝিতে পারিত, এ ক্ষেত্রে পাঁঠাটাকে ধরিয়া দিয়া আসিবার জন্য তাহার কি এমন মাথাব্যথা। সে মূল্য লইয়া বিক্রেয় বস্তু ক্রেতার হাতে তুলিয়া দিয়াছে। তার পর সে জিনিস কোথায় গেল, তাহার কি হইল, এত খোঁজে তাহার দরকার কি? এখানে ক্রেতাই দায়ী; ন্যায়ের সূক্ষ্ম তর্কে সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

কিন্তু দুঃখের মা কখনও ন্যায়ের তর্ক লইয়া আলোচনা করে নাই। সে গরীবের মেয়ে, সংসারে শুধু ধর্ম্ম অধর্ম্ম এই দুইটা জিনিসই চিনিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং সে হারানো পাঁঠাটার জন্য আপনাকেই সম্পূর্ণ দায়ী স্থির করিল, এবং তাহাকে দেখিয়াও ছাড়িয়া দিলে ধর্ম্মের নিকট

দোষী হইবে ভাবিয়া লইল। সে পশ্চাৎ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া পাঁঠাটাকে টানিতে টানিতে দ্রুতপদে দত্তবাবুদের বাড়ীর দিকে চলিল।

৬

পাঁঠার জন্য দত্তবাবুদের বাড়ীতে হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছিল। সকলেই জানে, রামজীবন দত্তের পূজা যে সে পূজা নয়, যথার্থ সাত্বিকী পূজা; এ পূজার তিলমাত্র ত্রুটী হইবার যো নাই। যাহা নিয়ম, দত্তজা অর্থ সামর্থ্য দিয়া যেরূপেই হউক, তাহা নিশ্চয়ই করিবেন। জগদম্বার উপর তাঁহার অচলা ভক্তি, সে ভক্তির তিলমাত্র ব্যতিক্রম হইলে, মায়ের পূজার একটু অঙ্গহানি হইলে তিনি আছাড় খাইয়া পড়েন। সন্ধিপূজায় কৃষ্ণবর্ণ ছাগে মায়ের প্রীতি, সুতরাং কালো পাঁঠা চাই-ই। পাঁচখানা গ্রাম খুঁজিয়া, অনেক কল কৌশলে সংগৃহীত সেই পাঁঠা পলাইয়াছে। তাহার অন্বেষণে গ্রাম ছাড়িয়া ভিন্ন গ্রামে লোক ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু পলায়িত পাঁঠার কোনও সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না। সময়ও নাই, রাত্রি পোহাইলেই সন্ধিপূজা; পূজো রাত্রিতে নয়, দিনমানে বেলা আটটার সময়। মাঝে আর একটা রাত্রিমাত্র ব্যবধান। ইহার মধ্যে যদি পাঁঠা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ! পূজার নিয়মভঙ্গ হইবে, মা রুষ্ট হইবেন, ভক্তের ভক্তির মূলে কুঠার পড়িবে।

দত্তজা অনাহারে মায়ের সম্মুখে বসিয়া মাথা কুটীতে লাগিলেন; আর লোকজনদের হুকুম দিলেন, "যেখান থেকে পার, পাঁঠা খুঁজে এনে হাজির কর। যে আন্‌তে পারবে, সে নগদ দশ টাকা বকশীস পাবে।"

বকশীসের লোভে দূরদূরান্তরে লোক ছুটিল।

এমন সময় দুখের মা যখন আঁচলে বাঁধা পাঁঠা লইয়া উপস্থিত হইল,

তখন বাড়ীতে একটা হৈ হৈ পড়িয়া গেল। দত্তজা প্রতিমার দিকে চাহিয়া ভক্তি গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, "মা গো, তুই-ই সত্যি নিজের বলি নিজেঁ খুঁজে এনেছিস্। তুই কি কখন ভক্তের প্রাণে ব্যথা দিতে পারিস্?"

আকুলি মহাশয়ের ধড়ে যেন প্রাণ আসিল। তিনি তাড়াতাড়ি এক-গাছা শক্ত দড়ি আনিয়া পাঁঠাটাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন, এবং বুঝাইয়া দিলেন, "এ সব দুখের মারই বজ্জাতী! এই মাগীই পাঁঠা লুকিয়ে রেখে ছিল। এখন বকশীসের লোভে এনে হাজির করেছে।"

দত্তজা ক্রুদ্ধ হইয়া গম্ভীরস্বরে আদেশ দিলেন, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে মাগীকে গ্রামের বা'র করে দাও।"

সকলেই চীৎকার করিয়া এই ন্যায্য দণ্ডের অনুমোদন করিল। দুখের মা সেই উন্মত্ত জনকোলাহলের মধ্যে বিস্ময়স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় দীনু খোড়ুই আসিয়া তাহার গা ঠেলিয়া বলিল, "মর্ মাগী, এখানে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্, আর সেখানে ছেলেটা যে হ'য়ে এসেছে। সে ঝেড়ে ঝেড়ে উঠছে, আর 'কাপড়, কাপড়' ব'লে চেঁচাচ্চে। এতক্ষণ বোধ হয় নাই।"

দুখের মা একটা আর্ত্তনাদ করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার করুণ আর্ত্ত চীৎকারে উৎসবময় পূজা প্রাঙ্গণ কাঁপিয়া উঠিল। ঔষধের শিশিটা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

দত্তজা গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ করিলেন, "হতভাগা মাগীকে বাইরে টেনে নিয়ে যা।"

তাঁরপর তিনি আকুলি মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কাল পাটের কাপড় দিয়ে মায়ের আলাদা এক প্রস্থ ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন ক'রে রাখ।"

পূজক বিদ্যানিধি মহাশয় মুক্তকণ্ঠে তাঁহার ভক্তির সাধুবাদ করিয়া উঠিলেন।

বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া তখন চণ্ডে মাতাল স্খলিতচরণে জড়িতকণ্ঠে গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল,—

"দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে মন ! কেবল ভক্তিমাত্র উপাসনা ;
তুমি লোক-দেখানো ভক্তি কর, মা তো কারো ঘুষ খাবে না।
মন তোমার কি ভ্রম ঘোচে না।"

———

ভূতের বেগার

১

"মোলেম ভূতের বেগার খেটে ;
আমার কিছুই সম্বল নাই মা গেঁটে।"

শ্রাবণের মেঘমেদুর অপরাহ্ণটা বড়ই নিরানন্দময় হইয়া উঠিয়াছিল। ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, ডোবার পাশে বেঙ ডাকিতেছিল, ঠাণ্ডা পূবে বাতাস বাঁশগাছের মাথা দোলাইয়া বহিয়া যাইতেছিল। এমনি সময়ে পরাণ বারিক ঘরের সাম্‌নে ছোট চালাটিতে বসিয়া, কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়াইয়া শণের দড়ি কাটিতে কাটিতে আপন মনে গাহিতেছিল,—

"মোঁলেম ভূতের বেগার খেটে ;
আমার কিছুই সম্বল নাই

আবার

নিজে হই সরকারী মুটে,
আমি দিন-মজুরী নিত্য

"আমি কাউকে সেজে দিতে বলি

মোলে

"আমি কার বেগার খাট্‌চি বারিক ?"

একটা ভাঙ্গা টোকা মাথায় দিয়া আহ্লাদী আসিয়া চালায় উঠিল, এবং ভিজা কাপড়ের খুঁট্‌টা নিঙ্‌ড়াইতে নিঙ্‌ড়াইতে সহাস্যে বলিল, "আমি কার বেগার খাট্‌চি বারিক ?"

পরাণ বাঁ হাতে শণের আগা এবং ডান হাতে ঢেরাটা ধরিয়া, সহাস্য দৃষ্টিতে আহ্লাদীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার।"

ঠোঁট ফুলাইয়া আহ্লাদী বলিল, "ইস্, আমার বোয়ে গেছে তোর বেগার খাট্‌তে।"

পরাণ হাসিয়া বলিল, "তবে বিষ্টিতে ভিজে ভিজে মত্তে এলি কেন ?"

আহ্লাদী বলিল, "মত্তে আসি নাই, তার এখনও দেরী আছে। তোকে বেগার খাটাতে এসেচি।"

"তবু ভাল" বলিয়া পরাণ মৃদু হাসিল, তার পর ঢেরায় পাক দিয়া বলিল, "বেগারটা কি রে আহ্লাদি ?"

"খুব শক্ত বেগার ; পার্‌বি ?"

"আমি আবার না পারি কি ?"

"বিশেষ আমার জন্যে।"

"কেন, তুই কি ?"

"তোর আঁধার ঘরের মাণিক।"

"দূর পোড়ারমুখি।"

আহ্লাদী টোকাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "তবে চল্‌লুম।"

পরাণ সে দিকে না চাহিয়া, দড়ি গুটাইতে গুটাইতে বলিল, "যা।"

পুনরায় রাখিয়া আহ্লাদী বলিল, "বিষ্টিটা বড্ড চেপে

আহ্লাদী বলিল, “কোথায় বসি? তোর ঘরে কি বস্‌বার কিছু জায়গা আছে?”

পরাণ খড়ের বিঁড়াটা তাহার দিকে সরাইয়া দিল। আহ্লাদী সেটা পা দিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, “তুই বোস্। আমি কি খড়ের বিঁড়েয় বস্‌তে পারি?”

ঈষৎ হাসিয়া পরাণ বলিল, “তোর তরে রাজসিংহেসন চাই নাকি?”

ঠোঁট ফুলাইয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে আহ্লাদী বলিল, “কপাল তোর, আমাকে সিংহাসনে বসাবি। নিজে মরিস্ ছেঁড়া চেটায়ে শুয়ে।”

“ছেঁড়া চেটাই আমার সিংহাসন।”

“তোর্ সিংহাসন তোরি থাক্, আমি তার ভাগ চাই না।”

“ভাগ চাইলেও আর পেলি কোথায়? ভাগ তো পেয়েই ছিলি, কিন্তু বিধি যে—

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই পরাণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। আহ্লাদীর মুখখানা ভারী হইয়া আসিল। সে সরিয়া গিয়া হাত বাড়াইয়া ছাচার জল লইয়া উঠানে ছড়াইতে লাগিল। পরাণ জোরে জোরে ঢেরায় পাক দিতে থাকিল।

সহসা আহ্লাদী পরাণের দিকে ফিরিয়া বলিল, “এমন বাদ্‌লায় তামাক খাস্ না যে?”

পরাণ বলিল, “কে সেজে দেয়?”

আহ্লাদী ঘাড় নাড়িয়া, চোখ নাচাইয়া বলিল, “ইস্, বাবুকে আবার তামাক সেজে দিতে হবে?”

মুখ টিপিয়া হাসিয়া পরাণ বলিল, “আমি কাউকে সেজে দিতে বলি নাই।”

আহ্লাদী চুপ করিয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর হুকার মাথা হইতে কলিকাটা খুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তামাক কোথায়?"

পরাণ বলিল, "ঘরের ভিতর চোঙ্গায় আছে। উনানে আগুন না থাকে তো খড়ের লুটী পাকিয়ে—"

"ও সব আমার কাজ নয়" বলিয়া আহ্লাদী বিরক্তভাবে কলিকাটা ঠুকিয়া বসাইয়া দিল এবং ব্যস্তভাবে টোকাটা তুলিয়া উঠানে নামিল। ঈষৎ হাসিয়া পরাণ বলিল, "তোর তো কাজ নয়, তা জানি, কিন্তু আমার কাজ কি, তা ব'লে গেলি না?"

আহ্লাদী ফিরিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "বোল্‌বো আবার কি? ঘরে জল পড়্‌চে।"

পরাণ। কাল ভাতখাবার ছুটিতে এসে সেরে দেব। খড় আছে?

আহ্লা। না।

পরাণ। আচ্ছা, আমিই এক বোঝা নিয়ে যাব।

আহ্লাদী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তা হ'লে ঐখানেই তো খাবি?"

পরাণ ব্যস্তভাবে বলিল, "না না, খেতে হবে না, আমি খেয়েই যাব।"

আহ্লাদী তীব্রদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পরাণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তার পর চড়া গলায় বলিল, "তোর যেতে হবে না। আমরা অন্য লোক দিয়ে ঘর সারাব, না পারি, জলে ভিজ্‌বো, তোর যেতে হবে না।"

আহ্লাদী দ্রুতপদে চলিয়া গেল। পরাণ ঢেরাটা ধরিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তার পর ঢেরায় পাক দিতে দিতে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল,—

"মোলেম ভূতের বেগার খেটে;
আমার কিছুই সম্বল নাই মা গেঁটে।"

(২)

পরাণকে বাস্তবিকই ভূতের বেগার খাটিতে হইতেছিল। সংসারে ভূতের বেগার অনেককেই খাটিতে হয়, কিন্তু পরাণের মত বেগার খাটিতে কাহাকেও হয় নাই। অল্পবয়সে বাপ মারা গেলেও পরাণের কষ্ট পাইবার মত অবস্থা ছিল না। দুই পাঁচ বিঘা ধান জমি ছিল, খেয়া ঘাটের জমা ছিল, তিন চারিটা পুকুর ভাগে দেওয়া ছিল। কিন্তু এই ভূতের বেগার খাটিতেই তাহার সব গেল, পাড়ার অপর সকলের মত দিন-মজুরী করিয়া তাহাকে দিন চালাইতে হইল M.

কুক্ষণে পরাণ আহ্লাদীকে বিবাহ করিবার জন্য জেদ ধরিয়াছিল। বুড়া পিসী অনেক বারণ করিয়াছিল, আহ্লাদীর চেয়ে খুব ভাল মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিল, কিন্তু পরাণ বুড়ীর কথা শুনে নাই। সেই যে সে এক এক দিন স্তব্ধ মধ্যাহ্নে খেয়া ঘাটে তালপাতার কুঁড়ের ভিতর পড়িয়া একা ঘুমাইত, আর আহ্লাদী চুপে চুপে গিয়া তাহার নাকে খড়ের ডগা গুঁজিয়া দিত, পায়ে সুড়্‌সুড়ি দিত, আর পরাণ উঠিয়া ধরিতে গেলেই কালো ঠোঁট দুটিতে মৃদু হাসির তরঙ্গ তুলিয়া চঞ্চলপদে ছুটিয়া পলাইত, তাহার মাথার খাটো খাটো চুলগুলিতে বাতাসে ঢেউ খেলিতে থাকিত, কোন দিন শান্ত-শিষ্ট মেয়েটির মত গিয়া তাহাকে তামাক সাজিয়া দিত, আবার কোন দিন বা তামাক সাজিতে বলিলে কলিকা আছ-ড়াইয়া তামাক ছড়াইয়া, হুঁকা ফেলিয়া একটা কাণ্ড করিয়া বসিত, শেষে পরাণের হাতের চড় খাইয়া, চোখ রাঙ্গাইয়া, ঠোঁট ফুলাইয়া তীব্রদৃষ্টিতে পরাণের দিকে চাহিয়া থাকিত তখন হইতেই পরাণের মনটা এই দুষ্ট মেয়ে-টির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। আহ্লাদী যদি একদিন তাহার কুঁড়েয় হাজির না হইত, তাহা হইলে সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় সে আহ্লাদীর ঘরে গিয়া তাহার খোঁজ লইয়া তবে ঘরে ফিরিত।

তাহার পর যখন আহ্লাদীর বিবাহের কথা উঠিল, তখন পরাণ নিজেই উপযাচক হইয়া আহ্লাদীর পাণিপ্রার্থী হইল ; বুড়া পিসীর নিষেধ, প্রতিবাসীদের বাধা কিছুই মানিল না।

তা আহ্লাদীর মায়ের ইহাতে কোন আপত্তি ছিল না। সে আশার অতিরিক্ত সাড়ে পাঁচ গণ্ডা টাকা পণ পাইয়া পরাণের মত ভাল ছেলের হাতে মেয়ে দিতে সহজেই রাজী হইল। বিবাহের সব ঠিকঠাক হইয়া গেল। কিন্তু যত গোল বাধাইল :তারিণী চৌধুরী।

তিন বৎসর আগে চৌধুরী মহাশয় একটা মারপিটের মোকদ্দমায় পরাণকে সাক্ষী মানিয়াছিলেন, কিন্তু পরাণ হলপ করিয়া মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজি হয় নাই, তাঁহার মুখের উপর সাফ জবাব দিয়া তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছিল, সেই হইতে চৌধুরী মহাশয় এই পাজী ছোট লোকটাকে শিক্ষা দিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে ছিলেন। কিন্তু সুযোগ এ পর্য্যন্ত বড় একটা পাইলেন না। তার পর যখন আহ্লাদীর সঙ্গে পরাণের বিবাহ হইতেছে শুনিলেন, তখন তিনি আহ্লাদীর খুড়া বিরুকে ডাকাইয়া বলিলেন, "পরাণের সহিত আহ্লাদীর বিবাহ না দিয়া তাঁহার চাকর খুদীরামের সহিত বিবাহ দিতে হইবে।" বীরু ইহাতে মত দিতে পারিল না। কেন না, আহ্লাদীর বিবাহে তাহার মাতারই কর্ত্তৃত্ব, বীরুর তাহাতে কোন হাত নাই। একান্নে থাকিলেও অনেকটা হাত থাকিত। কিন্তু বড় ভাই হীরু বাঁচিয়া থাকিতেই সে পৃথক হইয়াছিল

চৌধুরী মহাশয় আদেশ দিলেন; "আহ্লাদীর মাকে বুঝিয়ে ঠিক কর্।

বীরু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সে বুঝবার মেয়ে নয় বড় কর্ত্তা।"

চৌধুরী মহাশয় রাগে আগুন হইয়া বলিলেন, "না বোঝে, মাগীকে ঘরে বন্ধ ক'রে আগুন ধরিয়ে দাও।

কিন্তু ইংরাজ-রাজত্বে কাহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া পোড়াইয়া মারা যে সহজ অপরাধ নয়, ইহা মামলাবাজ চৌধুরী মহাশয়েরও অজ্ঞাত ছিল না, সুতরাং মুখে বলিলেও কাজে তিনি করিতে পারিলেন না। তিনি বীরুকে লইয়া অন্য উপায়ের উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

উপায় উদ্ভাবিত হইল, কিন্তু বাহিরের লোকে তাঁহার কিছুই জানিতে পারিল না। সেই দিন জানিল, যখন পরাণ বরবেশে ঘটের সম্মুখে বসিয়াছে, পুরোহিত ফুলের মালায় আহ্লাদীর হাতের সঙ্গে তাহার রোমাঞ্চিত হাতটা বাঁধিয়া দিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন, আর আহ্লাদীর মা সেই দুরুচ্চার্য্য সংস্কৃত মন্ত্র কোনরূপে উচ্চারণ করিয়া বর কন্যার হস্তে কুশবারি নিক্ষেপ করিতেছে, সেই শুভ বাসরে, সেই মঙ্গলময় মুহূর্তে যেন ডাকাত আসিয়া পড়িল। দশ-পনেরো জন উন্মত্তভাবে আসিয়া তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দিল। আহ্লাদীর মা চীৎকার করিয়া উঠিল, একজন তাহাকে টানিয়া আনিয়া মুখ চাপিয়া ধরিল; আর একজন পরাণকে বরের আসন হইতে তুলিয়া দিয়া সেখানে খুদীরামকে বসাইয়া দিল। বীরু আসিয়া সম্প্রদাতার আসনে বসিল। তারপর ভীতিকম্পিত পুরোহিতের মুখ হইতে সম্প্রদানের মন্ত্র উচ্চারিত না হইতেই জোরে জোরে শাঁক বাজিয়া উঠিল। খুদীরামের সহিত আহ্লাদীর বিবাহ হইয়া গেল।

উত্তেজিত পরাণ পরদিনই আদালতে গিয়া খুদীরাম ও চৌধুরী মহাশয়ের নামে নালিশ রুজু করিয়া দিল। মোকদ্দমা প্রায় এক বৎসর চলিল। পরাণের যাহা কিছু সঞ্চয় ছিল, সব বাহির করিল; সে খোরাকীর ধান বেচিল, জমি বাঁধা দিল, তথাপি মোকদ্দমায় জয়ী হইতে পারিল না। গ্রামে সাক্ষী-সাবুদ তেমন পাইল না। শেষ আশা ছিল পুরোহিতের উপর। কিন্তু তিনি যখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া হলপ

পড়িয়া বিপরীত কথা বলিতে লাগিলেন, তখন পরাণ মুখ নিচু করিয়া আদালতের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। হাকিমের রায়ে খুদীরামের সঙ্গেই আহ্লাদীর বিবাহ সাব্যস্ত হইয়া গেল।

রায়ের নকল লইয়া পরাণ উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়াই শুনিল, আজ সকালে খুদীরামের মৃত্যু হইয়াছে। এখনও তাহার দাহ হয় নাই, আহ্লাদী ও আহ্লাদীর মার চীৎকারে পাড়ার লোক অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

পরাণ গিয়া খুদীরামের দাহকার্য্যের ব্যবস্থা করিল।

৩

পরাণ কেবল খুদীরামের দাহকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াই অব্যাহতি পাইল না, আহ্লাদীর ও আহ্লাদীর মায়ের পেট চলিবার ব্যবস্থাও তাহাকে করিতে হইল। তাহাদের তখন দিন চালাইবার কোন উপায় ছিল না। খুদীরামের মৃত্যুর পর আহ্লাদীর মা পরাণের নিকট প্রস্তাব করিল যে, পরাণ আহ্লাদীকে লইয়া ঘর-সংসার করুক, আসল বিবাহ তো তাহার সঙ্গেই হইয়াছে। পরাণ শুনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "উহুঁ, লোকে কি বল্‌বে।"

তখন আহ্লাদীর মা দেবরকে গিয়া ধরিল; বলিল, "কি হবে ঠাকুরপো?"

বীরু বলিল, "মেয়ের সাঙ্গা দাও, আমি বর খুঁজে দিচ্ছি।"

আহ্লাদী শুনিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ছি!"

যখন আর কোন উপায় নাই, তখন পরাণকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপায় বিধান করিতে হইল। সে আহ্লাদীর মাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "ভয় কি, আমার একমুঠো জোটে তো তোমাদেরও জুটবে।"

পরাণ দুইটা পেট চালাইবার ভার লইল বটে, কিন্তু তখন তাহার নিজের পেট চালানই ভার হইয়া উঠিয়াছিল। জমার জমি সব গিয়াছিল, খাজনা বাকী পড়ায় খেয়া ঘাটত অন্য লোকে ডাকিয়া লইয়াছিল, মোকদ্দমার সময় দেখা-শোনা করিতে না পারায় পুকুরের ভাগও ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। এখন শুধু দিন-মজুরীর উপর নির্ভর। এই দিন মজুরীর উপর নির্ভর করিয়াই পরাণ স্বেচ্ছায় আহ্লাদী ও আহ্লাদীর মায়ের ভার লইল।

বুড়া পিসী গজ্ গজ্ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার গজ্‌গজানী পরাণকে বেশী দিন সহ্য করিতে হইল না। শীঘ্রই সংসারের অপর পার হইতে বুড়ীর ডাক আসিল। সে ডাকে বুড়ি চলিয়া গেল, পরাণও অব্যাহতি পাইল।

পরাণ বুড়ীর হাত হইতে অব্যাহতি পাইল বটে, কিন্তু আর একটা ভারী দায়ে ঠেকিল। আগে পরাণ খাটিয়া আসিয়া এক মুঠা তৈরী ভাত পাইত, এখন কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের পর ক্ষুধার দুঃসহ তাড়না চাপিয়া, রাঁধিয়া খাইতে হয়। সে যে কি নিদারুণ কষ্ট, তাহা পরাণ ছাড়া আর কেহ বুঝিতে পারে না। কোন দিন হাঁড়ি ভাঙ্গে, কোন দিন উনান জ্বলে না, কোন দিত ভাত ধরিয়া যায়; আর শ্রমক্লিষ্ট ক্ষুৎপীড়িত পরাণের চোখের জলে বুক ভাসিতে থাকে।

কোন দিন খাওয়া হইত, কোন দিন হইত না। কেবল খাওয়ার ব্যাঘাত নয়, ঘর-দ্বার অপরিষ্কার হইল, উঠানে ঘাস জন্মিল, ঘরে কি আছে না আছে, কিছুই ঠিক রহিল না। দুপুর-বেলা আসিয়া রান্না চাপাইয়া দেখিত, ঘরে নুন নাই, সন্ধ্যা দিতে গিয়া দেখিত, ভাঁড়ে তেল নাই, জল খাইতে গিয়া দেখিত, কলসীতে জলাভাব। পরাণ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। আহ্লাদীর মা প্রস্তাব করিল, পরাণের হাত

পোড়াইয়া খাইবার দরকার নাই, তাহাদের ঘরেই খাওয়া দাওয়া করুক্। পরাণ কিন্তু ইহাতে সম্মতি দিল না। আহ্লাদীর ইহাতে রাগ হইল, দুঃখ হইল, পরাণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না।

আহ্লাদী কিন্তু রাগ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে মধ্যে মধ্যে আসিয়া পরাণের ঘর-দ্বার পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাইত, থালা-ঘটীগুলা নোংরা হইলে মাজিয়া দিত, পরাণের ফিরিতে বিলম্ব হইলে তাহার ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া যাইত। পরাণ ইহাতে আপত্তি করিলে আহ্লাদী বলিত, "তা হ'লে বারিক, তোর একটা পয়সা যদি খাই, তবে আমি বাপের বেটীই নই।" অগত্যা পরাণ আর আপত্তি করিতে পারিত না।

লোকে বলিত, "পরাণ, বিয়ে কর্।"

পরাণ উত্তর করিত, "নিজের পেট চলে না, বিয়ে ক'রে কি ক'র্‌বো?"

লোকে বলিত, "নিজের পেট চলে না তো উপরি দুটো পেট চালাচ্চিস্ কি ক'রে?"

পরাণ হাসিয়া উত্তর দিত, "কে কার চালায়; যে চালাবার সেই চালাচ্চে।"

তাহার এই বিসদৃশ উত্তর শুনিয়া লোকে মুখ মুচকাইয়া হাসিত। আর পরাণ আপনার ছোট চালাটিতে খড়ের বিড়ার উপর বসিয়া আপন মনে গাহিত,—

"মোলেম ভূতের বেগার খেটে।"

৪

পরাণ বলিল, "আর ভাল লাগে না আহ্লাদী, তোকে সাঙ্গা করি আয়।"

আহ্লাদী উঠান ঝাঁট দিতেছিল; সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল্ দেখি?"

পরাণ বলিল, "কেন আবার কি? সাঙ্গা হ'লে দুজনে মিলে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-ঘরকন্না ক'র্‌বো।"

আহ্লাদী হাতের ঝাঁটাটা মাটীতে ঠুকিতে ঠুকিতে মুখ নিচু করিয়া বলিল, "তোর বড় কষ্ট হচ্ছে, না বারিক?

পরাণ বলিল, "আমার কথা ছেড়ে দে, কিন্তু তোর এই বয়েস—"

আহ্লাদী ঘাড় উঁচু করিয়া রোষক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "দেখ্, মুখ সাম্‌লে কথা কইবি।"

পরাণ মৃদু হাসিল, আহ্লাদী জোরে জোরে উঠান ঝাঁট দিতে লাগিল।

পরাণ ডাকিল, "আহ্লাদি!"

আহ্লাদী মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দিল, "কি?"

প। আমাদের বিয়েটা যদি সত্যি হতো?

আ। তা হ'লে কি হতো?

প। তা হ'লে আজ তুই আমার কত আপনার।

আ। এখন কি আমি পর?

প। ঠিক পর না হ'লেও তবু তেমনটা নয়। মনে কর্, তা হ'লে আজ আমাকে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হতো না, ঘর দোরও এমন লক্ষ্মীছাড়ার মত হয়ে থাক্‌ত না। তা হ'লে আমি খেটে খুটে আস্‌তাম, তুই রেঁধে বেড়ে আমার জন্যে পথ চেয়ে ব'সে থাক্‌তিস্। আমি খেতে বস্‌লে তুই কাছে ব'সে—"

আহ্লাদী ঝাঁটাটা ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে চোখ রগড়াইতে লাগিল। পরাণ জিজ্ঞাসা করিল, "চোখে কি হলো ?"

আহ্লাদী ভারী গলায় উত্তর করিল, "ধূলো উড়ে পড়লো। তোর উঠানে যে ধূলো !"

পরাণ ঈষৎ হাসিল; বলিল, "সাধে কি বল্‌চি আহ্লাদি, সাঙ্গা করি আয়।"

আহ্লাদী চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া তীব্র তিরস্কারের স্বরে বলিল, "আজকাল বুঝি এই সব কুকথা ভাবিস্ ?"

পরাণ বলিল, "কুকথা নয় আহ্লাদি, খুব ভাল কথা।"

আহ্লাদী রাগিয়া ঘাড় দোলাইয়া বলিল, "তোর ভাল কথা তোরই থাক্, আমাকে এ সব মাণিকপীরের গান শোনাতে আসিস্ কেন বল তো ?"

সহাস্যে পরাণ বলিল, "তোকে শোনাবো না তো আর কাকে আমি শোনাব ?"

"যমকে" বলিয়া আহ্লাদী মুখ ফিরাইয়া পুনরায় স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। পরাণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার ডাকিল "আহ্লাদি !"

আহ্লাদী উত্তর দিল না। পরাণ বলিল, "আচ্ছা আহ্লাদি, আমি যদি একটা বিয়ে করি ?"

আহ্লাদী বলিল, "তা হলে আমি পা ছড়িয়ে ব'সে কাঁদি।"

পরাণ। কিন্তু তুই সাঙ্গা কর্‌লে আমি হাসি।

আহ্লাদী। মাইরি ?

পরাণ। মাইরি।

আহ্লাদী। তবে তো আমাকে শীগ্‌গির একটা সাঙ্গা ক'রে দেখতে হবে।

পরাণ। সত্যি করবি?

আহ্লাদী। সত্যিই করবো।

পরাণ। আমার দিব্য ক'রে বল্ দেখি।

আহ্লাদী ঝাঁটাটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল; ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "এই রইলো তোর কাজ। তোর ঘরে যদি আর আসি—"

কথাটা শেষ না করিয়াই আহ্লাদী জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল। পরাণ খুঁটী ঠেস দিয়া বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

৫

পরাণ দুই তিন দিন আহ্লাদীর দেখা পাইল না। ভাবিল, "আহ্লাদী রাগ ক'রেছে। তা করুক্, তার রাগ বেশী দিন থাকবে না। আবার আপনিই ছুটে আস্‌বে।" কিন্তু চার পাঁচ দিনেও আহ্লাদী যখন একবারও দেখা দিল না, তখন পরাণ নিজেই তাহার সহিত দেখা করিতে গেল। দেখা করিতে গিয়া সে দেখা পাইল না। শুনিল, আহ্লাদী তারিণী চৌধুরীর বাড়ীতে ঝিগিরির কাজ লইয়াছে। সারাদিন সেখানে থাকে, রাত্রে ঘরে শুইতে আসে। পরাণ ভাবিল "এ আবার আহ্লাদীর কি খেয়াল!"

রাত্রিতে পরাণ আসিয়া আহ্লাদীর সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাহার এই অদ্ভুত খেয়ালের কারণ কি জানিতে চাহিল। আহ্লাদী চড়া সুরে স্পষ্ট কথায় তাহাকে জানাইয়া দিল যে, গতর থাকিতে সে কেন পরের রক্ত-উঠা পয়সা বসিয়া বসিয়া খাইবে? ইহাতে অধর্ম্ম হয়, পাঁচজনেও পাঁচ কথা বলে। ক্ষমতা থাকিতে সে কেন এমন অন্যায় কাজ করিবে? সে আর পরাণের পয়সা খাইবে না। পরাণও যেন আর তাহাকে সাহায্য করিতে না আসে, তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখে।

উত্তর শুনিয়া পরাণ স্তম্ভিত হইল। সে বুকের ভিতর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া ফিরিয়া গেল।

পরাণের গৃহ অনেক দিন হইতেই শূন্য; কিন্তু আজ যেন তাহার বড় বেশী বেশী শূন্য বোধ হইতে লাগিল। আজ তাহার চিরপরিচিত ঘরখানা যেন ঘরই নয়, যেন তাহা জনমানবশূন্য স্তব্ধ অরণ্যানী। আজ আর সেখানে একটুও আসক্তি নাই, একটুও আকর্ষণ নাই, বিন্দুমাত্র মমতা নাই; সব যেন একটা প্রলয়ের অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, শুধু তাহার ভস্মস্তূপের ভিতর হইতে একটা প্রচণ্ড উত্তাপ আসিয়া পরাণের দীর্ণ ভগ্ন বুকটাকে ঝল্‌সাইয়া দিতেছে।

ঘরের ভিতর শুইয়া পরাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। মেঘের গর্জ্জন, বায়ুর হুহুঙ্কার, বৃষ্টির প্রচণ্ড তাণ্ডব, সকলই যেন তাহার নিকট স্বপ্নের একটা বিচিত্র দৃশ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন পরাণের কম্প দিয়া জ্বর আসিল। জ্বরের সময় তৃষ্ণার প্রকোপে অধীর হইয়া পরাণ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া কলসী হইতে জল গড়াইতে গেল; কিন্তু কলসীতে এক বিন্দুও জল ছিল না। পরাণ কলসীটাকে মেঝের উপর আছাড় দিল। মাটীর কলসী শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া ছড়াইয়া পড়িল, কিন্তু তাহা হইতে এক বিন্দু জল বাহির হইল না। পরাণ আসিয়া পুনরায় শয্যার উপর শুইয়া পড়িল; আকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "একটু জল দে আহ্লাদি, একটু জল দে।"

আহ্লাদী তাহার চীৎকার শুনিতে পাইল না। প্রাণঘাতী তৃষ্ণার তীব্র যাতনায় পরাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

রোগ-শয্যায় শুইয়া পরাণ প্রতিজ্ঞা করিল, "চুলোয় যাক্‌ আহ্লাদী, ভাল হয়ে উঠে আগে বিয়ে কর্‌বো, তার পর অন্য কথা।"

রোগমুক্ত হইয়া পরাণ বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিল। একটি এগার বছরের মেয়ে পাওয়া গেল। ঘরজামাই হইয়া থাকিতে হইবে। পরাণের তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই ছিল না। সে পণের ও ঘর-খরচার জন্য

চিন্তামণি পালের হাতচিঠায় ঢেরা সই দিয়া সাড়ে পাঁচ গণ্ডা টাকার সংগ্রহ করিল।

(৬)

"কি হবে বারিক ?"

সে দিন বিবাহ। পরাণ একখানা হলুদমাখা নূতন আটহাতি কাপড় এবং গলায় এক ছড়া নূতন কাঠের মালা পরিয়া, খড়ের বিঁড়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিল, এবং তামাক টানিতে টানিতে অনেক দিন আগেকার এমনই একটা ব্যগ্রতাপূর্ণ দিনের কথা বুঝি মনে মনে ভাবিতেছিল। এমন সময় আহ্লাদী ধীরে ধীরে আসিয়া দাবার এক পাশে পা ঝুলাইয়া বসিল, এবং কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, "কি হবে বারিক ?"

পরাণ হুঁকা হইতে মুখ সরাইয়া আহ্লাদীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে আহ্লাদি ?"

মুখ নিচু করিয়া আহ্লাদী বলিল, "আমার পাপের প্রাচিত্তির হ'য়েছে।"

পরাণ বিস্মিত দৃষ্টিতে আহ্লাদীর দিকে চাহিয়া রহিল। আহ্লাদী বলিল, "তারিণী বাবু আমাদের চাল কেটে তাড়িয়ে দেবে।"

হুঁকাটা উচু করিয়া ধরিয়া পরাণ বলিল, "তোদের অপরাধ ?"

আহ্লাদী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি তার কথায় রাজি হই নাই।"

পরাণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা আহ্লাদি ?"

আহ্লাদী একবার ছল ছল চোখে পরাণের মুখের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল। পরাণ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "সে কি কথা ?"

আহ্লাদী চোখে আঁচল চাপা দিল; অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সে বড় নোংরা কথা বারিক, সে কথা আমি তোর সাম্‌নে—"

আহ্লাদী আর বলিতে পারিল না, ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরাণ হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

বসিয়া বসিয়া পরাণ গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "আহ্লাদি!"

আহ্লাদী মুখ তুলিয়া চাহিল। পরাণ বলিল, "তুই দু'দিন আগে কেন বল্‌লি না আহ্লাদী? আজ যে আমার বিয়ে।"

আহ্লাদী চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ তোর বয়ে ব'লে মনে ছিল না বারিক! তবে আমি যাই।"

আহ্লাদী চলিয়া যাইতেছিল, পরাণ বলিল, "শোন্।"

আহ্লাদী ফিরিয়া দাঁড়াইল। পরাণ বলিল, "সাঙ্গা কর্‌বি?"

আহ্লাদী ঈষৎ রুদ্ধস্বরে বলিল, "কাকে? তোকে?"

পরাণ। যাকে তোর ইচ্ছা।

আহ্লাদী। কেন বল্ দেখি?

পরাণ। আমি তো তোদের সংসার চালাতে পার্‌বো না। ঘরজামাই হ'তে হবে।

আহ্লাদী তীব্রদৃষ্টিতে পরাণের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না, তুই ঘরজামায়ে হ'য়েই থাক্, আমার বরাতে যা আছে, তাই হবে।"

আহ্লাদীর স্বরটা যেন অভিমানে জড়াইয়া আসিল। সে আর দাঁড়াইল না, মুখ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

পরাণ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর উঠিয়া গলার মালা ছড়াটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল; হলুদমাখা কাপড়খানা ছাড়িয়া একখানা পুরাতন কাপড় পড়িল, এবং ঘরে চাবী দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সেই দিন নির্দ্দিষ্ট পাত্রীর অন্য বরের সহিত বিবাহ হইয়া গেল। পরাণ চিন্তামণি পালের টাকাটা ফেরত দিয়া পুনরায় আগেকার মত মজুরী খাটিয়া দিন চালাইবার সঙ্কল্প করিল। কর্জ্জের টাকার কিছু খরচ হইয়া গিয়াছিল। পরাণ স্থির করিল, এই টাকাটার যোগাড় করিয়া দেনার সমস্ত টাকা একেবারে ফেলিয়া দিবে।

সঙ্কল্প পূর্ণ করিবার আগেই পরাণ হঠাৎ এক দিন বদমায়েসী অজুহাতে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইল। গ্রামের অনেকেই তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। তারিণীবাবু নিজে আদালতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পরাণের বদমায়েসী সম্বন্ধে এমন কত কথা বলিলেন, যাহা পরাণের কল্পনাতেও কখনও উদয় হয় নাই। সে সকল কথা শুনিয়া পরাণ স্তম্ভিত হইল। পরাণ স্তম্ভিত হইলেও হাকিম কিন্তু এমন সম্ভ্রান্ত সাক্ষীর সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি পরাণের আড়াই শত মুচলেখার তলব করিলেন; মুচলেখা দিতে না পারিলে দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড। পরাণ মুচলেখা দিতে পারিল না, জেলে গেল। তারিণী বাবু ফিরিয়া পাঁঠা কাটিয়া বিশালাক্ষীর পূজা দিলেন, এবং ছাগ মাংস ও লুচী-সংযোগে পরিপাটীরূপে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দিলেন। আহারান্তে ব্রাহ্মণগণ দীর্ঘ উদ্গারের সহিত তারিণী বাবুর প্রতি এমন সকল আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে তারিণীবাবুর জীবনে তাহার শতাংশের একাংশ ফলিলেও যথেষ্ট হইত।

(৭)

দুই মাস পরে পরাণ যখন জেল হইতে খালাস পাইয়া বাড়ীতে ফিরিল, তখন আহ্লাদী তাহার কাছে আসিয়া সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "সব শুনেছিস্ বারিক?"

পরাণ উত্তর করিল, "শুনেছি।"

আহ্লাদী মুখ নীচু করিয়া পায়ের নখ দিয়ে মাটী খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "দুখ্যু করিস্ না বারিক, দায়ে পড়েই—"

ম্লান হাসি হাসিয়া পরাণ বলিল, "দায়ে পড়েই হোক্ আর ইচ্ছা করেই হোক্, সাঙ্গা ক'রে খুব ভাল করেছিস্ আহ্লাদী। আর কোন বেটা বেটী একটা কথা বল্‌তে পার্‌বে না।"

একটু থামিয়া পরাণ বলিল, "সে দিন আদালতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারিণীবাবু যে সব কথা বল্‌লে; ছি ছি, ও ভদ্দর লোক না ছোট লোক? এমনি তখন ইচ্ছে হলো—"

আহ্লাদী বলিল, "ও ভদ্দর লোক না হাড়ী। তুই জেলে যাবার পর, একদিন রেতের বেলায় বাড়ীচড়াও হ'য়ে যে কাণ্ডটা ক'রেছিল, ভাগ্যে ভাগ্যে বঁটিখানা হাতের কাছে ছিল তাইতেই রক্ষা! তার পরই ধর্ম্ম রাখ্‌বার জন্যে এই কাজ ক'রে ফেলেছি বারিক!"

পরাণ গুম্ হইয়া বসিয়া ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। সেই দিন গভীর রাত্রিতে একটা বিকট কোলাহলে পরাণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাহিরে আসিল। আসিয়া দেখিল, কায়েত পাড়ার দিক্ হইতে অগ্নির লেলিহমান প্রচণ্ড শিখা উত্থিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। পরাণ ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে ছুটিল।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া পরাণ দেখিল, তারিণীবাবুর বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। বড় ঘরের চাল্‌টা ধূ ধূ শব্দে জ্বলিতেছে, চালের বাঁশ-কাঠ জ্বলিতে জ্বলিতে ফট্ ফট্ শব্দে ফাটিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে স্ফুলিঙ্গরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, গোঁ গোঁ শব্দে গর্জ্জন করিয়া অগ্নি দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিতেছে।

বাহিরে অনেক লোক জমিয়াছে; তাহাদের মধ্যে তারিণীবাবু মাথায় হাত চাপ্‌ড়াইয়া পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া চীৎকার করিতেছে, "ওরে,

আমার বাক্সটা এনে দে। পাঁচ শো টাকা দেব, আমার বাক্সটা এনে দে, আমার দলীলপত্র সব যায় রে।”

পরাণ একবার তাঁহার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, গোঁ ভরে বাড়ীর ভিতর—প্রজ্বলিত বহ্নিস্তূপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

অল্পক্ষণ পরে কে একজন বাক্সটা তারিণীবাবুর পায়ের কাছে আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া জনতার মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহা কেহই ঠিক লক্ষ্য করিতে পারিল না।

পরদিন তারিণীবাবু লোকের কাছে বলিতে লাগিলেন, “এ পরাণ বারিকের কাজ। বেটা কাল জেল থেকে খালাস পেয়ে এসে, রাগে আমার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কি বল্‌বো, সাক্ষী-সাবুদ নাই, নইলে বেটাকে ফের জেলে পূরে দিতাম।”

পরাণ লোকের মুখে কথাটা শুনিয়া মৃদু হাসিল, কোন প্রতিবাদ করিল না। সে পূর্ব্ববৎ আপনার ছোট চালাটিতে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে গুণ গুণ স্বরে গাহিতে লাগিল,—

“মোলেম ভূতের বেগার খেটে ;
আমার কিছুই সম্বল নাই কো গেঁটে।”

দাদার ভাই

১

বুদ্ধিমান্ মোক্তার অবিনাশ দে মৃত্যুকালে আপনার সমগ্র সম্পত্তি কেন যে গোঁয়ারগোবিন্দ বৈমাত্রেয় ভাই বিনোদের নামে উইল করিয়া দিল, তাহা আমড়াগাছীর কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

বিষয় যে নিতান্ত অল্প, তাহা নয়। সাড়ে আট হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ, সত্তর বিঘা লাখরাজ জমী। তা ছাড়া ঘর, ভিটা, পুকুর, বাগান, বাগিচা, এ সবই ছিল। এ সকলই অবিনাশের মোক্তারীর পয়সায় উপার্জ্জিত। ভিটাটুকু ছাড়া আর কিছুই পৈতৃক ছিল না। অবিনাশের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিল; সাত বছরের ছেলে কালীচরণ ছিল। ইহা সত্ত্বেও অবিনাশ যে কেন বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে—অবাধ্য গোঁয়ারগোবিন্দ বিনোদকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া গেল, তাহা এক দিকে যেমন অতিমাত্র বিস্ময়জনক, অন্য দিকে তেমনই অবিনাশের নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, ইহা ভাবিয়া লইতে কাহারও বিলম্ব হইল না।

বিনোদকে সকলেই গোঁয়ারগোবিন্দ ও উচ্ছৃঙ্খল ছোকরা বলিয়া জানিত। সে যে কখনও দাদার বিচারেও সুবোধ বালক বলিয়া গণ্য ছিল না, বরং সকল বিষয়েই অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়া দাদার বিরাগ-ভাজন হইত, ইহা কাহারও অবিদিত ছিল না। বাপ যখন মারা যান, তখন বিনোদের বয়স দশ এগারো বৎসর। তখনও সে চিন্তামণি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সর্দ্দারপোড়োর পদ অধিকার করিয়াছিল। অবিনাশের তখন মোক্তারীতে একটু একটু পসার জমিতেছিল। পিতার মৃত্যুর পর অবিনাশ তাহাকে পাঠশালা ছাড়াইয়া সেনহাটীর ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কিন্তু ছুটীতে দাদা যে কয় দিন বাড়ীতে থাকিতেন, সেই কয় দিন বিনোদ স্কুলে যাতায়াতের কষ্ট স্বীকার করিত না। সকালে সন্ধ্যায় পক্ষিশাবকের অন্বেষণ, এবং মধ্যাহ্নে মৎস্যশিকার কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া দিনগুলাকে বেশ সহজভাবেই কাটাইয়া দিত।

বাড়ীতে মা ছিলেন না। তিনি অনেক দিন আগেই—বিনোদকে চারি বৎসরের রাখিয়া, সংসার হইতে ছুটী লইয়াছিলেন। ছিল শুধু বৌদিদি। তাঁহারও সন্তানসন্ততি ছিল না। সুতরাং এই বন্ধ্যা রমণীর সমগ্র স্নেহ মাতৃহীন দেবরকেই কেন্দ্র করিয়া লইয়াছিল। অপত্যস্নেহটা পরের ছেলের উপর আসিয়া পড়িলে তাহা নিজের ছেলের অপেক্ষা কিছু অতিরিক্তমাত্রাতেই প্রকাশ পায়, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিয়মের বশে বিনোদ বৌদিদির নিকট যেটুকু তাড়না বা তিরস্কার পাইত, সেটুকু তাহার বুদ্ধির নিক্তিতে বৌদিদির স্নেহ অপেক্ষা একটুও গুরু বলিয়া বোধ হইত না। সুতরাং বিনোদ সুখকর মৎস্যশিকার-প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ক্লেশকর বিদ্যাশিক্ষার দিকে মনোযোগ দিবার আবশ্যকতা আদৌ অনুভব করিত না।

অবিনাশ বাড়ী আসিয়া যখন ভ্রাতার বিদ্যা পরীক্ষা করিতে চাহিতেন,

তখন ভাইয়ের বিত্যার দৌড় দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন। তার পর লোকের মুখে তাহার গুণের কথা শুনিয়া রাগিয়া উঠিতেন। রাগিয়া বিনোদকে ধমক দিতেন, মারিতে যাইতেন, দুই একটা চড় চাপড় দিতেও ছাড়িতেন না। তারপর তিনি ভ্রাতাকে পুনরায় স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া কর্ম্মস্থলে যাত্রা করিতেন। দাদা ষ্টেশনে না পঁহুছিতেই বিনোদ পুনরায় ছিপ বঁড়শীর সংস্কারে প্রবৃত্ত হইত, এবং যাহারা দাদার কাণ ভারী করিত, তাহাদের গাছের ফল ও পুকুরের মাছ সমূলে নষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকিত।

এমনই করিয়া ছয় সাত বৎসর কাটিয়া গেলেও বিনোদ যখন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর কঠোর গণ্ডী ভেদ করিতে পারিল না, অধিকন্তু নবোদ্গত গুম্ফরাজি লইয়া অজাতগুম্ফ বালকদের সহিত একাসনে বসিতে লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল, তখন অবিনাশ বিরক্ত হইয়া তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়া দিলেন। বিনোদ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

বড় বৌ স্বামীকে অনুরোধ করিল, "বেন্দার বয়স হ'য়েছে, বিয়ে দাও।"

দুই একবার স্ত্রীর অনুরোধে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেও, শেষে অবিনাশকে ভ্রাতার বিবাহের চেষ্টা দেখিতে হইল। ছেলের কোনও গুণ না থাকিলেও, এ দেশে মেয়ের অভাব হয় না। বেটা ছেলে তো বটে! সুতরাং অনেক জায়গা হইতে বিবাহ-সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। অবিনাশ তাহাদের মধ্যে একটী ভাল ঘর, ভাল মেয়ে দেখিয়া দেনা-পাওনা স্থির করিয়া ফেলিলেন, এবং মাঘ মাসে বিবাহের দিন স্থির করিয়া পূজার ছুটীতে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। কিন্তু অগ্রহায়ণের শেষে বিনোদ হঠাৎ একদিন মামারবাড়ী গিয়া মামার প্রতিবেশী দীনু ঘোষের চোদ্দ বছরের মেয়েকে বিবাহ করিয়া ঘরে

ফিরিল। অবিনাশ রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন। বড় বৌ তাঁহাকে শান্ত করিল; বলিল, "বেন্দার কাজটা ভাল হয় নি বটে, বৌ কিন্তু দিব্যি মনের মত হ'য়েছে গো." অগত্যা অবিনাশকে তাহা মানিয়া লইতে হইল।

অতঃপর অবিনাশ আদালতে বিনোদের চাকরী করিয়া দিলেন। কিন্তু বিনোদ দুই দিন কাজ করিয়াই বুঝিতে পারিল, এইরূপে দশটা পাঁচটা পর্য্যন্ত এক জায়গায় বসিয়া কলমপেশা তাহার কর্ম্ম নয়। বিশেষতঃ, মধ্যাহ্ন উপস্থিত হইলেই মাঠপুকুরের ধারে বটগাছের ছায়ায় বসিয়া চারের চারি পাশে বৃহৎ বৃহৎ রোহিত মৎস্যের উল্লম্ফন একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ করিবার স্মৃতি আসিয়া তাহাকে বড়ই অধীর করিয়া তুলিত। এ অধীরতা বিনোদ অধিক দিন সহ্য করিতে পারিল না। এক সপ্তাহ চাকরীর পর অসুস্থ হইয়া বিনোদ সেই যে বাড়ী গেল, আর কর্ম্মস্থলে ফিরিল না। প্রত্যহ সদ্যোধৃত মৎস্য ভোজন দ্বারা রোগের প্রতীকার করিতে লাগিল।

বড় বৌ বলিল, "হাঁ রে বেন্দা, চাকরী করবি নি তো খাবি কি?"

বিনোদ উত্তর করিল, "দাদা জানে।"

বড় বৌ বলিল. "দাদা কি তোকে চিরকাল বসিয়ে খাওয়াবে?"

জোরে মাথা নাড়িয়া বিনোদ বলিল, "নি-শ্চয়।"

বড় বৌ হাসিয়া উঠিল। অবিনাশ শুনিয়া বলিলেন, "নেহাৎ হতভাগা।"

তারপর একদিন বড় বৌ অন্তিমশয্যায় শয়ন করিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া যখন ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো, বেন্দার কি হবে?" তখন অবিনাশ কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তার জন্য কাতর হ'য়ো না বড় বৌ, আমার যা কিছু সবই তার।"

বড় বৌ নিশ্চিন্তমনে হাসিতে হাসিতে পরলোকে চলিয়া গেল।

বৌদিদির মৃত্যুতে বিনোদ তিন দিন তিন রাত্রি অন্নজল স্পর্শ করিল না; দুই মাস মাঠ-পুকুরের ধারে গেল না।

কিছু দিন পরে অবিনাশ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। নূতন বড় বৌ আসিয়া পুরাতন সংসারে জাঁকিয়া বসিল। একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল; বিনোদেরও একটি মেয়ে হইল। কিন্তু বিনোদের প্রকৃতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। সে মাছ ধরিয়া, তাস পিটিয়া, স্বচ্ছন্দচিত্তে দিন কাটাইতে লাগিল।

এ দিকে হঠাৎ অবিনাশের দিন ফুরাইয়া আসিল। অবিনাশ যখন তাহা বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি তাড়াতাড়ি একখানা উইল করিয়া ফেলিলেন, এবং তাহাতে বিনোদকেই তাঁহার সমগ্র সম্পত্তির অধিকারী করিয়া, সতীসাধ্বীর অন্তিম শয্যাপার্শ্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিলেন। লোকে সে প্রতিজ্ঞার কথা জানিত না, সুতরাং তাহারা অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল।

২

লোকে ভাবিয়াছিল, বিনোদের নামে উইল করিলেও, অবিনাশ আপনার ভূসম্পত্তি বা নগদ টাকাকড়ির কিছু না কিছু স্ত্রীপুত্রকে দিয়া যাইবেন। কিন্তু শ্রাদ্ধশেষে সর্ব্বসমক্ষে যখন উইল পড়া হইল, তখন লোকের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। উইলে স্ত্রীপুত্রের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত ছিল না।

শ্রীপতি ঘোষাল বলিলেন, "তাই তো, অবিনাশ বুদ্ধিমান্ হ'য়ে এমন কাজটা কেন ক'রে গেল?"

ভোলানাথ ঘোষ বলিল, "মাথার ঠিক ছিল না, সেটাও দেখা দরকার।"

বুড়া মৃত্যুঞ্জয় দত্ত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এখন এই বিধবা আর নাবালক দাঁড়ায় কোথায়, সেইটেই হচ্চে প্রধান ভাবনা।"

বিনোদ রাগিয়া বলিল, "পরের ভাবনা এতটা না ভেবে আপনারা নিজের চরকায় তেল দিন গে দত্ত মশায়!"

দত্ত মহাশয় রাগে মাথা কাঁপাইতে কাঁপাইতে বলিলেন, "থাম হে বাপু, নিজের চরকায় তেল দিয়ে দিয়ে মাথার চুল সাদা ক'রেছি। স্ত্রীপুত্র কেউ হ'লো না, সতাতো ভাই হ'লো আপনার। আমরা সবই বুঝে থাকি।"

বিনোদ চড়া গলায় উত্তর দিল, "বুঝে থাকেন, ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবেন।"

অবিনাশের দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুর মাধব সরকার উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিনোদকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "রাগ ক'রো না বাবাজী, দত্তজা যা বল্‌ছেন, তা ন্যায্য কথাই বল্‌ছেন।"

বিনোদ বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল; ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "দাদা যা ন্যায্য বুঝেছেন তাই ক'রে গেছেন; দাদার কথার উপর কথা কইবার অধিকার কোন বেটারই নাই।"

সরকার মহাশয় বলিলেন, "অপরের না থাকলেও, আইনের সে অধিকার আছে।"

চীৎকার করিয়া বিনোদ বলিল, "আইন? আইন জানে কোন্ বেটা? আমার দাদা ছিল আইনের জহুরী।"

বিনোদ রাগে জোরে জোরে পা ফেলিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। উপস্থিত সকলেই পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

বাড়ীর ভিতর গিয়া বিনোদ বড় বৌকে ডাকিয়া বলিল, "শুনেছ বড় বৌ, বেটারা বলে কি না দাদা বে-আইনী কাজ ক'রে গেছেন। আরে বেটারা, আমার দাদা কি যে সে লোক ছিল? আইনের পাকা জহুরী, বুঝলে বড় বৌ, আইনের পাকা জহুরী।"

বড় বৌ মুখ ভার করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

মাধব সরকার দত্তজার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারটা কি বলুন দেখি; আমার বোধ হয় উইলটা জাল।"

দত্তজা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন, "উইল যে জাল নয়, তা আমি জানি। তবে সে সময়ে আপনার জামাতার মাথার ঠিক ছিল কি না, সেইটাই হচ্চে কথা। প্রমাণ কর্‌তে পার্‌বেন?"

সরকার মহাশয় বলিলেন, "এক জন ভাল উকীলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখি।"

কয়েক দিন কন্যাগৃহে অবস্থানের পর সরকার মহাশয় যে দিন গৃহ-গমনে উদ্যত হইলেন, সে দিন মেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার কি হবে বাবা?"

সরকার মহাশয় কন্যাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "কোনও চিন্তা নাই মা, মাধব সরকার বেঁচে থাক্‌তে আর একজন যে তোমার বিষয় ফাঁকি দিয়ে নেবে, তা কখনই হবে না।"

৩

তাসের আড্ডায় দুইখানা ছক্কা এবং একখানা বোম্‌ খাইয়া বিনোদ যখন নিতান্ত অপ্রফুল্লচিত্তে ঘরে আসিল, তখন ছোট বৌ তাহার সম্মুখে গিয়া সকাতরে বলিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, যাদের বিষয় তাদের ফিরিয়ে দাও। আমার সতু বেঁচে থাক্‌, তুমি ভিক্ষে ক'রে এনে তাকে খাওয়াবে।"

বিনোদ হুঁকা কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে যাইতেছিল, স্ত্রীর কথায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, হয়েছে কি?"

ছোট বৌ মিনতি করিয়া বলিল, "না গো, এমন শাপ-সম্পাতের বিষয়ে আমার কাজ নাই।"

উগ্রস্বরে বিনোদ বলিল, "বিষয়ে তোমার দরকার না থাকে, আমার আছে। শাপসম্পাত দিচ্ছে কে?"

মৃদুকণ্ঠে ছোট বৌ বলিল, "যার বিষয়—দিদি।"

বিনোদ মাটীতে পা ঠুকিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "দিদি শাপসম্পাত দেবার কে? বিষয় তাঁরও নয়, তাঁর বাবারও নয়। আমার দাদার রোজগার করা বিষয়, আমাকে দিয়ে গেছে।"

হাত দুইটা যোড় করিয়া ছোট বৌ সভয়ে বলিল, "ওগো! তোমার পায়ে পড়ি, একটু আস্তে কথা কও, ও ঘরে দিদির বাবা আছেন।"

কিন্তু আস্তে কথা কওয়া বিনোদের আদৌ প্রকৃতিগত ছিল না, তাহার উপর রাগিলে তো রক্ষা ছিল না। সুতরাং সে পূর্ব্ববৎ জোর গলায় বলিল, "থাকলেই বা দিদির বাবা, আমি কারো চুরী করি নাই যে আস্তে আস্তে কথা কহিব। দিদির বাবা কি বলেছেন?"

ছোট বৌ নতমুখে শঙ্কাকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "কত কি; মকদ্দমা করবেন, তোমাকে জেলে দেবেন, এমনি কত কথা বলছেন।"

বিনোদ চীৎকার করিয়া বলিল, "সরকার মহাশয় এই সব কুমন্ত্রণা দিতেই বুঝি মেয়ের কাছে আসেন? এমন যদি হয়, তা হ'লে—"

সম্মুখের ঘর হইতে সরকার মহাশয় ডাকিয়া বলিলেন, "তা হ'লে কি হবে গো বিনোদ বাবু?"

সরকার মহাশয় আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইলেন। বিনোদ জ্বলন্ত-দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল। সরকার মহাশয় তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিলেন, "মেরে তাড়াবে নাকি?"

গর্জ্জন করিয়া বিনোদ বলিল, "দেখুন, সরকার মশায়, আপনি কুটুম্ব মানুষ, কুটুম্বের মত আস্‌বেন—যাবেন।"

সরকার মহাশয় বলিলেন, "আর তুমি পরের বিষয় নিয়ে দিব্যি মজা ওড়াও!"

রাগে চীৎকার করিয়া বিনোদ বলিল, "আমি আপনার বাবার বিষয় নিতে যাই নাই।"

মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে গম্ভীরস্বরে সরকার মহাশয় বলিলেন, "আমার বাবার বিষয়ে হাত দেয়, এমন বেটা ছেলে আজও জন্মায় নি। নাবালক ভাইপোর বিষয়টা ফাঁকি দিয়ে নেবার চেষ্টা কচ্চো।"

চীৎকারে বাড়ী কাঁপাইয়া বিনোদ বলিল, "কি আমি ফাঁকি দিচ্চি? কোন্ বেটা এমন কথা বলে?"

ঘাড় নাড়িয়া সরকার মহাশয় বলিলেন, "আমি বলি গো বিনোদ বাবু, আমি বলি। তা বাপু, ফাঁকি দেব মনে করলেই ফাঁকি দেওয়া যায় না। আইন আছে, আদালত আছে, বিচার আছে। সেখানে আর জুয়াচুরী খাট্‌বে না।"

হুঁকা কলিকা ফেলিয়া হাত দুইটা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বিনোদ বলিল, "বেরোও তুমি বাড়ী থেকে।"

বড় বৌ ঘর হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিল, এবং পিতার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো বাবা গো, ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'রো না গো। ও গুণ্ডা, এখনি খুনখারাপী ক'রে বসবে।"

বিনোদ দাঁতে দাঁত চাপিয়া রোষক্ষুব্ধকণ্ঠে ডাকিল, "বড় বৌ।"

ছোট বৌ গিয়া বিনোদকে টানিয়া ঘরে আনিল।

একটু পরে সরকার মহাশয় ছাতা চাদর লইয়া চলিয়া গেলেন।

যাইবার সময় তিনি অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়া গেলেন, "তুমি একটুও ভেবো না মা, আমি যদি তোমার বিষয়ের কড়া-ক্রান্তিটি পর্য্যন্ত আদায় ক'রে দিতে না পারি, তবে আমার নাম মাধব সরকারই নয়।"

পিতা চলিয়া গেলে বড় বৌ আপনার ঘরের দাওয়ায় পা ছড়াইয়া বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল, স্বর্গগত স্বামীর নির্বুদ্ধিতার উল্লেখ করিয়া অনেক আক্ষেপ করিল; তার পর যে তাহার বিষয় ফাঁকি দিয়া লইতেছে, তাহাকে কিরূপ শাস্তি দিতে হইবে, সে সম্বন্ধে দিন-রাত্রির কর্ত্তাকে উপদেশ দিতে লাগিল।

ছোট বৌ স্বামীর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো রক্ষা কর, বিষয় ছেড়ে দাও!"

দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বিনোদ বলিল, "এক কড়া কাণা কড়িও ছাড়ব না। দেখি, কে আমার দাদার চালের উপর চাল চাল্‌তে পারে।"

কয়েক দিন পরে বিনোদ যখন জজের কাছে উইলের প্রোবেট লইতে গেল, তখন বড় বউয়ের পক্ষ হইতে দরখাস্ত পড়িল, উইল প্রকৃত কি না, সে বিষয়ে আবেদনকারিণীর সন্দেহ আছে, এবং উইল করিবার সময়ে উইলকর্ত্তার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছিল কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়। অতএব হুজুর হইতে ইহার সুবিচারের আজ্ঞা হয়।

সুতরাং হুজুর হইতে বিচারের আজ্ঞা হইল। রীতিমত মোকদ্দমা বাধিল। দিনের পর দিন পড়িতে লাগিল। সরকার মহাশয় মেয়ের গহনা বেচিয়া উকীল মোক্তারের খরচ যোগাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ এরূপ মতও প্রকাশ করিল যে, এই সময়ে সরকার মহাশয়ের টানাটানির সংসার বেশ একটু স্বচ্ছল হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বিনোদের পক্ষীয় দুষ্ট লোকের মত, সুতরাং সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

৪

মোকদ্দমা করিতে গিয়া বিনোদ মহা বিপদে পড়িল। সে দেখিল, মোকদ্দমায় কেবল টাকার শ্রাদ্ধ হয় না, মানমর্য্যাদারও রীতিমত পিঁওদান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। এক দিকে মান বজায় করিতে গিয়া, অপর দিকে অপমানের একশেষ হইতে হয়। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আদালতে হাঁটাহাঁটি করিতে করিতে পা ছিঁড়িয়া যায়। সাক্ষীদের বাড়ী দিনে তিন বার যাতায়াত করিতে হয়, তাহাদের মন যোগাইতে হয়, দোকানের দেনা শোধ করিতে হয়, অনেক অন্যায় আব্দার সহ্য করিতে হয়। ছি ছি, লোকে কি সুখে মোকদ্দমা করে?

মোকদ্দমায় সুখ না থাকিলেও বিনোদ কিন্তু তাহা ছাড়িল না। ইহার সকল কার্য্য তাহার সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত হইলেও, সে এমনই ধীরতার সহিত কাজ করিয়া যাইতে লাগিল যে, লোকে তাহার প্রকৃতির বিপরীত আচরণ দর্শনে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা মত প্রকাশ করিল যে, বিষয়ের লোভে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

মোকদ্দমা যখন পূর্ণবেগে চলিতেছিল, তখন সহসা এক দিন বড় বৌ হাঁড়ী পৃথক্ করিয়া লইল; আলাদা রাঁধিয়া খাইল।

ছোট বৌ জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি পৃথক্ হ’লে দিদি?”

বড় বৌ মুখ ঘুরাইয়া বলিল, “তা হলাম বৈকি ভাই। আর দাঁতে জিভে ভালবাসায় কাজ কি।”

বিনোদ শুনিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল।

কিন্তু ছেলেটা বড় গোল বাধাইল। সে কাকাবাবুর সঙ্গে খাইবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিল না। বড় বৌ ছেলেকে বুঝাইল, ধমক দিল, ছেলে কিন্তু কিছুতেই বাগ মানিল না। বিনোদ আসনে বসিয়া কেলো বলিয়া ডাকিলেই সে মাতার তিরস্কার প্রহার সব

উপেক্ষা করিয়া কাকাবাবুর পাশে আসিয়া বসিত। ক্রমে ইহা বড় বৌয়ের অসহ্য হইল। শেষে এক দিন কালী কাকাবাবুর পাশে বসিয়া যখন ভোজনে উদ্যত হইয়াছে, তখন বড় বৌ বাঘিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া ছেলের পিঠে রীতিমত চড়-চাপড় বসাইয়া দিয়া এবং তাহাকে টানিয়া আনিয়া ঘরে পূরিয়া, ঘরে শিকল তুলিয়া দিল। ছেলে ঘর হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাকাবাবু গো, কাকা-বাবু গো!"

বিনোদ হাতের ভাত পাতে ফেলিয়া ডাকিল, "বড় বৌ!"

বড় বৌ কোনও উত্তর দিল না, গুম হইয়া দাবায় বসিয়া রহিল। বিনোদ বলিল, "ওকে ছেড়ে দাও বড় বৌ।

বড় বৌ গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিল, "কেন?"

বিনোদ। ও ভাত খাবে।

বড় বৌ। আর ভাত খাইয়ে কাজ নাই। গোড়া কেটে আর আগায় জল ঢাল্‌তে হবে না।

বিনোদ। ছাড়বে না?

বড় বৌ। না। বিষয় তো গ্রাস ক'রেছ, আবার ছেলেটাকেও গ্রাস কর কেন?

বিনোদ কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল; তার পর বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "তুমি বল কি বড় বৌ, কেলোকে আমি গ্রাস কর্‌ব? বিষ খাওয়াব নাকি?"

বড় বৌ বলিল, "কি খাওয়াবে না খাওয়াবে, কে দেখ্‌ছে বল।"

ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিয়া বিনোদ বলিল, "ছিঃ, তুমি নিতান্ত ছোট-লোক।"

বড় বৌ বলিল, "কে ছোটলোক কে ভদ্রলোক, তা বোঝাই যাচ্চে।"

বিনোদ চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমিই কিছুই বোঝ না বড় বৌ, তুমি মাধব সরকারের মেয়ে, উমেশ দের ছেলেদের বুঝতে তোমার বাবারও সাধ্যি নাই।"

বড় বৌ রাগিয়া বলিল, "দেখ ঠাকুরপো, ঠিক দুপুর বেলা বাড়াবাড়ি ক'রো না, তা বল্‌ছি।"

বিনোদ আর কোনও কথা না বলিয়া ভোজনে ব্যাপৃত হইল। ছেলেটা তখনও চীৎকার করিয়া ডাকিতেছিল, "কাকাবাবু গো, কাকাবাবু গো।"

বিনোদ হাতের ভাতগুলোকে থালায় আছড়াইয়া ফেলিয়া উঠিয়া গেল। বড় বৌ মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আহা হা, সোহাগ দেখেও বাঁচি না। বলে—মাছ মরেছে বেড়াল কাঁদে শাস্ত কল্লে বকে।"

৫

বছর খানেক পরে মোকদ্দমা মিটিল। বিচারে উইল প্রকৃত বলিয়া সাব্যস্ত হইল। বিনোদ যেদিন রায়ের নকল পাইল, সেদিন তাহার সগর্ব্ব আস্ফালনে পাড়া কাঁপিতে লাগিল। পাড়ার লোক বলিল, "বিনোদ, মোকদ্দমায় জিতেছ, এবার এক দিন খাইয়ে দাও।"

গর্ব্বস্ফীতকণ্ঠে বিনোদ বলিল, "মোকদ্দমায় আবার জিত হার কি, জিত তো হ'য়েই ছিল। আমার দাদা উইল লিখে গেছে, কার বাবার সাধ্যি তা রদ করে। দাদা ছিল আইনের জহুরী।"

বাড়ীতে আসিয়া বিনোদ উৎফুল্লকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, "শুনেছ বড় বৌ, মোকদ্দমায় জিত হ'য়েছে।"

বড় বৌ কিন্তু তাহার এ আনন্দসংবাদে কিছু মাত্র উৎফুল্লতা প্রকাশ করিল না। সে ঘরের ভিতর উপুড় হইয়া পড়িয়া মৃত স্বামীর উদ্দেশে, ধর্ম্মের উদ্দেশে তীব্র অভিসম্পাত প্রয়োগ করিতে লাগিল।

পর দিন ছোট বৌ বিনোদকে বলিল, "ওগো, দিদি বাপের বাড়ী চল্লো।"

বিনোদ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

ছোট বৌ বলিল, "কেন আর কি, দিদি বল্‌ছে, ওঁর আর এখানে কি, বিষয় আশয় তো সবই তোমার।"

ঈষৎ রুষ্টভাবে বিনোদ বলিল, "হ'লই বা আমার, তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে গেছে?"

ছোট বৌ বলিল, "কি হ'য়েছে না হ'য়েছে, তা আমি জানি না। দিদি কিন্তু যাবার যোগাড় কর্‌ছে।"

বিনোদ বড় বৌয়ের ঘরের কাছে গিয়া ডাকিল, "বড় বৌ!"

বড় বৌ তখন বাক্স পেট্‌রা গুছাইতে ব্যস্ত ছিল, বিনোদের ডাকে কোনও উত্তর দিল না। বিনোদ দাবার উপর উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বাপের বাড়ী যাবে বড় বৌ?"

বড় বৌ মুখ না ফিরাইয়াই তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর দিল, "হাঁ যাব।"

বিনোদ। কেন যাবে?

বড় বৌ; যাব না তো থাক্‌বো কোথায়?

বিনোদ। তোমার কি থাকবার জায়গা নাই?

বড় বৌ। কৈ আর আছে বল। এমন হতভাগা সোয়ামীর হাতে পড়েছিলাম যে, মাথা গুঁজে থাকবার জায়গাটি পর্য্যন্ত রেখে গেল না।

রাগে চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া বিনোদ বলিল, "মুখ সাম্‌লে কথা কও বড় বৌ, আমার দাদা হতভাগা?"

মুখ ফিরাইয়া গর্জ্জন করিয়া বড় বৌ বলিল, "একশো বার হতভাগা। যে স্ত্রী-পুত্রকে পথে বসিয়ে ভাইকে সর্ব্বস্ব দিয়ে যায়, সে আবার মানুষ?"

বিনোদ কঠোরদৃষ্টিতে বড় বউয়ের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বড় বৌ বলিতে লাগিল, "যেমন হতভাগার হাতে প'ড়েছিলাম, তেমনি তো ফলভোগ কত্তে হবে। আমার সব থাকতেও এখন বাপের বাড়ীতে গিয়ে দাসীবৃত্তি ক'রে খাই।"

বিনোদ বলিল, "তা হ'বে না বড় বৌ।"

বড় বৌ জিজ্ঞাসা করিল, "কি হবে না?"

বিনোদ। বাপের বাড়ী যাওয়া হবে না। আমার দাদার স্ত্রী যে মাধব সরকারের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করবে, তা কিছুতেই হতে পারে না M,

তীব্র শ্লেষের স্বরে বড় বৌ বলিল, "তবে কি তোমাদের দাসীবৃত্তি করতে হবে?"

বিনোদ বলিল, "তুমি বড় বৌ, তুমি দাসীবৃত্তি করবে ?"

কঠোরকণ্ঠে বড় বৌ বলিল, "দাদার বিষয়গুলি হাত ক'রে দাদার স্ত্রীর উপর যে বড় দরদ দেখছি।"

বিনোদ উচ্চকণ্ঠে বলিল, "বিষয়! বিষয়ের মুখে মারি লাথি। কিন্তু এই আমি বলছি বড় বৌ, আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে দিব না।"

বড় বৌ বলিল, "একশো বার দেবে। যেখানে আমার মাথা গুঁজে থাকবার স্থানটী পর্য্যন্ত নাই, সেখানে আমি কিছুতেই থাকব না।"

রাগে চীৎকার করিয়া বিনোদ বলিল, "আলবৎ থাকতে হবে; বিনোদলাল বেঁচে থাকতে কার সাধ্যি বাড়ীর চৌকাটের বাইরে পা দেয়।"

গর্জ্জন করিতে করিতে বিনোদ চলিয়া গেল। বড় বৌ বেগতিক দেখিয়া পিতাকে আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইল।

৬

চারি পাঁচ দিন পরে সরকার মহাশয় আসিলেন। তিনি কন্যাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই মা, আমি পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করবো। হাইকোর্টের এক জন বড় উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছি। তত দিন চল, আমার ঘরেই থাকবে মা,

বড় বৌ বলিল, "কিন্তু বাবা, ও গুণ্ডা যদি যেতে না দেয়?"

গর্ব্বপ্রফুল্লকণ্ঠে সরকার মহাশয় বলিলেন, "ওর বাবাকে যেতে দিতে হবে। আমি পুলিসে ডাইরী করিয়ে তবে এসেছি। তুমি সব গুছিয়ে নাও।"

বড় বৌ তখন পোঁটলা-পুঁটলী বাঁধিতে লাগিল।

বিনোদ ব্যস্তভাবে দাবার উপর উঠিয়া ডাকিল, "কেলো, কেলো!"

কালী মাতামহের কাছে বসিয়াছিল; কাকার ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া তাহার কাছে আসিল। বিনোদ পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিল, "এই নে।"

কালী কাগজখানা হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি কাকাবাবু?"

সহাস্যে বিনোদ বলিল, "ফলারের নিমন্ত্রণপত্র। বুঝলি?"

কালী বলিল, "নেমন্তন্ন? কোথায়?"

হাসিতে হাসিতে বিনোদ বলিল, "তোর শ্বশুরবাড়ীতে। তোর শ্বাশুড়ীর বিয়ে, তারই নিমন্ত্রণ। যাবি তো?"

কাকাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কালী বলিল, "তুমি যাবে?"

বিনোদ বলিল, "নিশ্চয়। তোর শ্বাশুড়ীর বিয়ে, আমি যাব না?"

উৎফুল্লস্বরে কালী বলিল, "ওহো, আমার শ্বাশুড়ীর বিয়ে!"

বিনোদ তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল; তার পর ধীরে ধীরে দাবা হইতে উঠানে নামিল।

কালী ঘরের ভিতর গেলে সরকার মহাশয় "দেখি" বলিয়া তাহার হাত হইতে কাগজখানা লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

বড় বৌ জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের কাগজ বাবা ?"

বিস্ময়ের আতিশয্যে সরকার মহাশয়ের হাতখানা তখন কাঁপিতেছিল, গলাটা শুকাইয়া কাঠ হইয়া আসিয়াছিল। কষ্টে একটা ঢোক গিলিয়া তিনি বলিলেন, "দানপত্র।"

বড় বৌ বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "দানপত্র ?"

শুষ্কমুখে ধরা-গলায় সরকার মহাশয় বলিলেন, "জামাই যে সম্পত্তি উইলে বিনোদকে দিয়ে গিয়েছিল, বিনোদ সেই সব সম্পত্তি কালীর নামে দানপত্র ক'রে দিয়েছে।"

বড় বউয়ের বিস্ময়স্তম্ভিত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "সব ?"

সরকার মহাশয় বলিলেন, "হাঁ, সব।"

বড় বৌ হাঁ করিয়া বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সরকার মহাশয় কাগজখানা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এখানা যত্ন ক'রে তু'লে রাখ।"

বড় বৌ কাগজখানা হাতে লইয়া ঘরের বাহিরে আসিল; উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "ঠাকুরপো।"

বিনোদ তখন জামা ছাড়িয়া দাবায় তামাক সাজিতে বসিয়া উগ্রকণ্ঠে বলিল, "দেখ বড় বৌ, এবার যদি কোথাও যেতে চাও, তা হ'লে ভাল হবে না—ব'লে রাখছি ; আমি একটা খুনখারাবী না ক'রে ছাড়ব না।"

বড় বৌ স্তম্ভিতদৃষ্টিতে দেবরের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরের ভিতর বসিয়া সরকার মহাশয় আপন মনে বলিলেন, "আদত বোকারাম। দাদার উপযুক্ত ভাই বটে।"

দাতারামের দুর্গোৎসব

১

চালতাপুরের দাতারাম সরকারের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইবে শুনিয়া গ্রামের লোকেরা যেরূপ বিস্ময় অনুভব করিল, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হইয়াছে দেখিলেও তাহারা ততটা বিস্ময় বোধ করিত কি না সন্দেহ। কেন না, গ্রামের সকলেই জানিত, দাতারামের মা-বাপ ভ্রম-ক্রমেই ছেলের নাম দাতারাম রাখিয়াছিল, তৎপরিবর্ত্তে কঞ্জুষরাম নাম রাখিলেই তাহার নামের সহিত কার্য্যের ঠিক সামঞ্জস্য থাকিত।

গ্রামের মধ্যে দাতারাম সরকার প্রসিদ্ধ মহাজন ও বিখ্যাত ছিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে গিয়া হাত পাতিলে তিনি নগদ দশ হাজার টাকা গণিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি যে টাকা পয়সা একবার সিন্দুকে তুলিতেন, খাতকের প্রয়োজন ব্যতীত তাহা আর সূর্য্যালোকের মুখ দেখিতে পাইত না। তবে তিনি পয়সা সিন্দুকে তুলিতেন না; টাকা, সিকি, দুয়ানী, আধুলীরই সিন্দুকে উঠিবার অধিকার ছিল। এ জন্য তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন,

সাত পয়সার অধিক পাওনা হইলে তিনি কাহারও নিকট খুচরা পয়সা লইবেন না। এই খুচরা পয়সাতেই তাঁহার সংসার চলিত। যে দিন পয়সার আমদানী হইত না, সে দিন ধারকর্জ্জ করিয়া সংসারের দৈনিক খরচ চালাইতেন, তথাপি দুল্লানীর থলীতে হাত দিতেন না।

সংসারে বিধবা ভগ্নী সুভদ্রা ছাড়া আর কেহ ছিল না। স্ত্রী অনেক পূর্ব্বেই গতাসু হইয়াছিলেন। তখনও দাতারামের বিবাহের বয়স যায় নাই; পাত্রীরও অভাব ছিল না। অভাব ছিল শুধু দাতারামের বিবাহ করিবার ইচ্ছার। পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া তিনি গলগ্রহ জুটাইতে এবং অনর্থক পোষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে রাজী ছিলেন না। অধিক বয়সে বিবাহ করার দোষ কীর্ত্তন করিয়া তিনি সুভদ্রাকেও নিরস্ত করিলেন।

ভগ্নী বিধবা, একাহারী; নিজেও পরম হিন্দু, মৎস্য মাংস স্পর্শ করিতেন না। সুতরাং সংসার অতি সহজেই চলিয়া যাইত। খাতকদের ক্ষেতের আলু, বেগুন, কচু, কাঁচকলার কল্যাণে নিরামিষাশী দাতারামের আহার্য্যের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা ছিল না।

পরম হিন্দু হইলেও দাতারাম কতকগুলা বিষয়ে ইংরাজী-শিক্ষিত নব্যগণের মতের অনুমোদন করিতেন। যেমন, ভিখারীকে মুষ্টিভিক্ষা দিলে সমাজে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। দৈব বা পিতৃকার্য্যে অর্থব্যয় কেবল অলস ব্রাহ্মণ জাতির উদরপূরণমাত্র, ইহা অপেক্ষা গরীব দুঃখীকে দু'পয়সা দিলে পুণ্য আছে (যদিও দাতারাম সে পুণ্যলাভের জন্য লালায়িত ছিলেন না) ইত্যাদি। এই মতে দৃঢ় আস্থা থাকিলেও সমাজ-শাসনের অনুরোধে তাঁহাকে যে সকল কাজ করিতে হইত, তাহা এরূপ সংক্ষেপে নির্ব্বাহ করিতেন, যাহাতে উদরপরায়ণ ব্রাহ্মণের পেটও না ভরে, অথচ নিজেরও কার্য্য উদ্ধার হয়। দাতারাম সুদের হিসাবের মত কাজকর্ম্মেরও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হিসাবে পারদর্শী ছিলেন।

এ হেন দাতারাম সরকার দুর্গোৎসব করিবেন শুনিয়া গ্রামের লোক যে আকাশ হইতে পড়িবে, তাহার আর বিচিত্র কি!

তা দাতারাম যে স্বেচ্ছায় এই অর্থহানিকর অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ইহা বলিলে তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক অর্পণ করা হইবে। পূজার মাসখানেক আগে গ্রামের কতকগুলা বওয়াটে ছোঁড়া আসিয়া বারোয়ারীর চাঁদার জন্য দাতারামকে ধরিয়াছিল। দাতারাম চাঁদা ত দিলেন না, অধিকন্তু এরূপ নিষ্ফল আমোদে অর্থব্যয় ও সময় নষ্ট করার জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কারও করিলেন। ছোঁড়ারা রিক্তহস্তে ফিরিয়া গিয়া অনেক পরামর্শের পর স্থির করিল, "রও বেটা কঞ্জুষরাম, এক টাকার বদলে তোমার একশো টাকায় ঘা দেওয়াব।"

দাতারাম ছোঁড়াদের পরামর্শের বিন্দুবিসর্গও জানিলেন না। জানিতে পারিলে মহালয়ার দিন কখনও এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইতেন না। প্রতিহিংসাপরায়ণ ছোঁড়ার দল তাঁহার দরজায় ঠাকুর ফেলিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি অন্য দিনের মত ভোরে উঠিলেই সকল গোল চুকিয়া যাইত; সেই ক্ষুদ্র প্রতিমাখানিকে আস্তে আস্তে তুলিয়া খিড়কী পুষ্করিণীর জলমধ্যে স্থাপন করিলেই ছোঁড়াদের নিদারুণ প্রতিহিংসা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইত। কিন্তু হায়, "দৈবী বিচিত্রা গতিঃ"; প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিলেও সেই দিনই তিনি বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার গাত্রোত্থানের পূর্ব্বেই পাড়ার ছেলে বুড়া সকলে তাঁহার দরজায় সমবেত হইয়া বিস্ময়পূর্ণ কোলাহল তুলিয়া দিয়াছিল।

২

সে দিন একটু বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইবার কারণও ছিল। পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় তাগাদা সারিয়া দাতারাম যখন ঘরে ফিরিলেন, তখন ভগ্নী সুভদ্রা বলিল, "দাদা, পুরুতঠাকুর ব'লে গেছেন, কাল শ্রাদ্ধ করতে হবে।"

দাতারাম সক্রোধে উত্তর করিলেন, "কার শ্রাদ্ধ? তোর, না আমার?"

সুভদ্রা একটু ব্যথিতস্বরে বলিল, "আমার শ্রাদ্ধ হ'লে ত সব আপদ চুকে যায় দাদা। কিন্তু তোমার—ছি ছি, কি অলক্ষণে কথাই যে বল?"

বিকৃতমুখে দাতারাম বলিলেন, "আর তোমার কথাটাই বুঝি খুব সুলক্ষণ হ'লো?"

সুভদ্রা বলিল, "আমি এমন কি মন্দ কথা ব'লেছি? বছরে একটা দিন, চোদ্দপুরুষকে একটু জলপিণ্ডী দেবে না?"

বিরক্তির সহিত দাতারাম বলিলেন, "এই যে পনরোটা দিন ধ'রে চোদ্দপুরুষকে আঁজলা আঁজলা জল দিলাম। এতেও কি তাঁদের পেট ভরে না?"

পিতৃপুরুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলেও দাতারাম তর্পণটা নিয়মিতরূপে করিতেন। বিনা আয়াসে প্রাপ্ত দুই অঞ্জলি জল দিলে যদি পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়, তবে তাহা দিতে ক্ষতি কি?

সুভদ্রা মুখ-ভার করিয়া বলিল, "চোদ্দপুরুষের পেট ভরেছে কি না, তা তুমিই জান। পুরুতঠাকুর ব'লে গেলেন, তাই বলছি।"

ভ্রূকুটী করিয়া দাতারাম বলিলেন, "ব'লে গেলেই ত হ'লো না। শ্রাদ্ধ হবে কি ক'রে, আজ তো নিরামিষ্য করা হয় নি?"

সুভদ্রা গালে হাত দিয়া বলিল, "ও মা, তুমি আবার কবে মাছ খাও দাদা, যে আলাদা নিরামিষ্যি করতে হবে?"

দাতারাম ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "মাছ খাই না ব'লে কি নিরামিষ্য করতে হবে না? শুধু মাছই খাই না, কলায়ের ডাল খাই, পুঁইশাক খাই, এগুলো তো আমিষ? সেই হাঁড়ীতে ত খেয়েছি?"

সুভদ্রা বলিল, "তা প্রাতঃস্নান করলেই হবে।"

দাতারাম বলিলেন, "হাঁ, আজ আমিষ খেয়ে কাল প্রাতঃস্নান করলেই হবে! ও সব নাস্তিকের কথা, ফাঁকির মতলব। আমার দ্বারা ও সব নাস্তিকের কাজ হবে না।"

সুভদ্রা রাগিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "নাস্তিকের কাজও হবে না, আস্তিকের কাজও হবে না। আসল কথা, পয়সা খরচ কর্‌তে পার্‌বে না।"

ভগ্নীর রাগ দেখিয়া দাতারাম একটু হাসিলেন; বলিলেন, "দূর পোড়ার-মুখী, পয়সা খরচকে কি আমি ভয় করি? কি জানিস্, ও সব ফাঁকির কাজে আমার মন যায় না। তা, তুই যখন রাগ কর্‌ছিস, তখন একটা ভুজ্যি উচ্ছুগ্‌গু করা যাবে!"

সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "রাতে কি খাবে?"

দাতারাম বলিলেন, "কিছু না। ভুজ্যি উচ্ছুগ্‌গু, এও ত এক রকম শ্রাদ্ধ। রাত্রে আর কিছুই খাব না।"

সুভদ্রা বুঝিল, দাদা এক বেলা উপবাস দিয়া ভোজ্যোৎসর্গের খরচের কতকটা সাশ্রয় করিলেন। আর দাতারাম শুইয়া এক সের চাউল দিবে, কি আধ সের চাউল দিবে, গামছা একখানা কিনিবে কি না, কিনিলেও তাহা দেড় হাতি কি দুই হাতি লওয়া হইবে, দক্ষিণা চার পয়সা কি দুই পয়সা দেওয়া উচিত, এই সকল ভাবিয়া একটা হিসাব নিকাশ করিতে লাগিলেন। হিসাব যখন স্থির হইল, তখন রাত্রি প্রায় তিন প্রহর। সঙ্কল্প স্থির করিয়া শেষরাত্রিতে দাতারাম ঘুমাইয়া পড়িলেন। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন প্রতিবেশীরা আসিয়া দরজায় কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে।

৩

দাতারামকে দেখিয়া, এবং তাঁহার ভীষণ ভ্রূভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া প্রতিবেশীরা যখন একে একে সরিয়া পড়িল, তখন দাতারাম উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "সুবি, ও সুবি!"

সুভদ্রা সম্মুখে আসিয়া বলিল, "কেন দাদা?"

ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে ভগ্নীর মুখের দিকে চাহিয়া দাতারাম উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "এ সব কি কাণ্ড কারখানা?"

সুভদ্রা ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "কি জানি।"

দাতারাম দাঁত মুখ খিঁচাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি জানি? তুমি জান না, আমি জানি না, তবে জান্‌বে কে? ও পাড়ার শঙ্করা?"

সুভদ্রা নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। দাতারাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এখন এই নিয়ে কি করা যায়?"

সুভদ্রা বলিল, "ঠাকুর নিয়ে আর কি করে? পূজো কর্‌বে।"

দাতারাম রাগিয়া বলিলেন, "পূজো? কে পূজো কর্‌বে?"

সুভদ্রা বলিল, "কে আবার? তুমি।"

দাতারাম বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "আমি? তুই বলিস্ কি সুবি, আমি গোঁসায়ের শিষ্যি আমি শক্তিপূজা কর্‌বো?"

সুভদ্রা চিবুকে অঙ্গুলি সংলগ্ন করিয়া বলিল, "ওমা, তুমি আবার গোঁসায়ের শিষ্যি হ'লে কবে দাদা?"

দাতারাম বলিলেন, "কবে কি? আমার সাত পুরুষ গোঁসায়ের শিষ্যি।"

সুভদ্রা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাতারাম বলিলেন, "আর ভেবে কি হবে, তুই এক দিক্ ধর, আমি এক দিক্ ধরি। ধ'রে পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে আসি?"

সুভদ্রা বিস্ময়-স্তম্ভিতকণ্ঠে বলিল, "বলো কি দাদা? মা ঘরে এসেছেন, তাঁকে জলে ফেলে দেবে?"

মুখভঙ্গী করিয়া দাতারাম বলিলেন, "তা নয় ত কি ঘরে তুলে ফুল চন্দন দিয়ে পূজো করবো?"

তীব্রস্বরে সুভদ্রা বলিল, "তা করবে কেন, সিন্দুকের পূজো করবে। গলায় দড়ি দাও দাদা।"

রাগে সুভদ্রা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দাতারাম মৃদু হাসিলেন; বলিলেন, "এই পোড়ারমুখী রেগে মরেছে। আরে! এ কি তোর মনসা-পূজো, লক্ষ্মী-পূজো, এ দুর্গোৎসব। বাবা! তা তুই না পারিস্ আমি নিজেই ফেলে দিয়ে আসছি।"

সুভদ্রা বলিল, "তা দাও, কিন্তু লোকে একঘ'রে করবে, তা জেনো।

দাতারাম বলিলেন, "তবে আমি ভয়েই সারা হ'লাম। আমি কোনও বেটা-বেটীর ঘরে পাত পাড়তে চাই না, কোনও বেটা-বেটীকে বাড়ীতে পাত পাড়াতেও ডাকি না।"

সুভদ্রা ভ্রাতার মুখের উপর তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল। দাতারাম বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

দাতারাম ঠাকুর ফেলিয়া দিবার কথা মুখে বলিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যে তাহা করিতে সাহসী হইলেন না। সমাজ-শাসনের ভয় আসিয়া বাধা দিল। দেবতার এই অবমাননা হিন্দুসমাজ কখনই সহ্য করিবে না; সমাজ তাঁহাকে ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত করিবে। তাঁহার ধোপা, নাপিত, হুঁকা বন্ধ হইবে; নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ রদ হইবে; সমাজ তাঁহার সহিত সর্ব্ব-প্রকার সংস্রব ত্যাগ করিবে। তাঁহার পয়সা থাকিলেও, গ্রামের অনে-কের মহাজন হইলেও, সমাজ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে না। গ্রামে একজন হাড়ীও যে সম্মান পায়, সে সম্মান হইতেও তিনি বঞ্চিত হইবেন।

দাতারাম ইহা জানিতেন; জানিতেন বলিয়াই তিনি ঠাকুর ফেলিয়া দিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি পুরোহিতের সঙ্গে পরামর্শ করিতে চলিলেন।

পুরোহিত কিন্তু যে ফর্দ্দ দিলেন, তাহা দেখিয়া দাতারামের চক্ষু স্থির হইল।

সে যে প্রায় দুই শত টাকার ফের। ফর্দ্দের অনেক কম করিলেও, দশ হাতি কাপড়কে ছয় হাতি করিলেও, দেড় শত টাকার কমে কিছুতেই হইবে না। দাতারাম রাগিয়া বলিলেম, "আমি এত টাকা খরচ কর্‌তে পার্‌ব্‌ না।"

পুরোহিত বলিলেন, "এর কমে দুর্গোৎসব হয় না।"

দাতা। না হয়, আমি ঠাকুর জলে ফেলে দিব।

ঈষৎ হাসিয়া পুরোহিত বলিলেন, "সে উপায় থাক্‌লে তুমি আমার কাছে আস্‌তে না।"

দাতারাম রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিলেন, "আপনি পুরোহিত ব'লেই আপনার কাছে এসেছি। যজমানের হিত করাই পুরোহিতের কর্ত্তব্য।"

পুরোহিত বলিলেন, "আমি তোমার অহিত চিন্তা করি নাই।"

দাতা। তাই বুঝি দু'শো টাকার লম্বা ফর্দ্দ দিলেন?

পুরো। দুর্গোৎসব কলির অশ্বমেধ, দু'শো টাকা কি বেশী খরচ হ'লো?

দাতা। আপনাদের পক্ষে বেশী নয়; কেন না, আপনারা পাবেন; আমার পক্ষের বেশী, কেন না, আমায় দিতে হবে।

পুরোহিত চুপ করিয়া রহিলেন। দাতারাম বলিলেন, "এত চাল, কাপড়, কলা, মূলো—এ সব কি হবে? মা কি খাবেন?"

পুরোহিত ঈষৎ রুষ্টভাবে বলিলেন, "মাকে খাওয়াবার সৌভাগ্য তোমার আমার নাই দাতারাম।"

দাতা। নাই ত এ সব কেন?

পুরো। শাস্ত্রের বিধান।

দাতা। ছাই বিধান! যার এত টাকা নাই, সে কি মায়ের পূজা কর্‌বে না?

পুরো। অসমর্থের পক্ষে বিধান অন্যরূপ।

দাতারাম ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, "আর আমই বুঝি সমর্থ? কেন দাঁতে দাঁত দিয়ে কোনও রকমে দু'টো পয়সা সঞ্চয় করেছি বলে বুঝি?"

দাতারামের সহিত তর্ক বিতর্ক বৃথা বিবেচনায় পুরোহিত নিরুত্তর রহিলেন। দাতারাম জোরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তা হবে না পুরুত মশায়, শাস্তর কেবলই আপনারাই যে জানেন, তা নয়; আমিও জানি। মায়ের পূজোয় ও সকলের কোনও দরকার নাই। রামপ্রসাদ কি ব'লে গেছেন, জানেন ত? 'আলো চাল আর পাকা কলা কাজ কিরে তোর আয়োজনে; তুমি ভক্তিসুধা পান করিয়ে তৃপ্ত কর আপন মনে।' এ যে সে লোকের কথা নয়, সাধক রামপ্রসাদের কথা, মা নিজে যাঁর বেড়া বাঁধতেন।"

পুরোহিত বলিলেন, "রামপ্রসাদের সে ভক্তি ছিল,আমাদের তা নাই।"

দাতারাম বলিলেন, "ততটা না থাক্, কিছুও ত আছে। ব্যস্, গাছের ফুল, বেলপাতা, পুকুরের জল, আর মনের ভক্তি এই হলেই যথেষ্ট। এই দিয়েই আমি মায়ের পূজো ক'র্‌বো।"

দাতারাম সত্বরপদে বাড়ীতে ফিরিলেন। সুভদ্রাকে ডাকিয়া উৎফুল্ল-কণ্ঠে বলিলেন, "না সুবি, আর জলে ফেলে কাজ নাই। মা যখন এসেছেন, তখন সাধ্যমত পূজোটা করাই দরকার। অভাগা কপালে আর ত কিছু হ'লো না, হবেও না; ভাল, মায়ের পায়ে এক অঁাজলা ফুল গঙ্গা-জল দেওয়া যাক্।"

ভ্রাতার মতিপরিবর্ত্তন দর্শনে সুভদ্রার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তখন ভাই-ভগ্নীতে ধরাধরি করিয়া প্রতিমাকে চণ্ডীমণ্ডপে তোলা হইল।

সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে দাদা, কিছু চাল ধান ক'র্‌তে হবে তো?"

হাত নাড়িয়া দাতারাম বলিলেন, "না না, সে সব কিছুই কর্‌তে হবে না।"

বিস্ময়ের সহিত সুভদ্রা বলিল, "তবে কিসে কি হবে?"

দাতারাম বলিলেন, "ফুল জল বেলপাত', এই হ'লেই যথেষ্ট। তুই মেয়ে মানুষ, কিছুই তো বুঝিস্ না। রামপেসাদের গান শুনিস্ নি?" বলিয়া দাতারাম গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিলেন—

"আলো চাল আর পাকা কলা কাজ কি রে তোর আয়োজনে,
তুমি ভক্তিসুধা—মন রে আমার—ভক্তিসুধা পান করিয়ে
তৃপ্ত কর আপন মনে।"

৪

ষষ্ঠীর দিন সকালে পুরোহিত কল্পারম্ভ করিতে আসিয়া দেখিলেন, রাশীকৃত ফুল, বিল্বপত্র, আর এক ঘড়া গঙ্গাজল ছাড়া পূজার অন্য কোনও উপকরণই নাই। পুরোহিত সুভদ্রাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ও সুভদ্রা, পূজার নৈবেদ্য কোথায়?"

সুভদ্রা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমি জানি না, দাদাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

দাতারাম অদূরে বসিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে আর জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইল না। তিনি উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "নৈবেদ্য অ বার কি হবে?"

পুরোহিত বলিলেন, "নৈবেদ্য না দিলে কি দিয়ে পূজা হবে?"

দাতারাম উত্তর করিলেন, "ফুল, গঙ্গাজল, আর ভক্তি।"

দাতারাম মুখে যাহা বলিয়াছিল, কাজেও যে তাহাই করিবে, পুরোহিত তাহা ভাবেন নাই। সুতরাং দাতারামের উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ পুরোহিত হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাতারাম সহাস্যে বলিলেন, ভাবছেন কি,এ আর কারো পূজা নয়, দাতারামের পূজা। দাতারাম মাকে চালকলা খেতে দেয় না। জানেন ত, রামপেসাদ কি ব'লে গেছে—"জগৎকে যে খাওয়ায় রে মন মিছরী আদি—"

বাধা দিয়া পুরোহিত বলিলেন, "মা সন্তানকে যাই খেতে দিক্, সন্তানের উচিত মাকে কিছু খেতে দেওয়া।"

দৃঢ়স্বরে দাতারাম বলিলেন, "নিশ্চয় দেব। মা চান ভক্তি—মাকে তাই দেব।"

গম্ভীরকণ্ঠে পুরোহিত বলিলেন, দিতে পারবে দাতারাম ?"

মাথা উঁচু করিয়া গর্ব্বস্ফীতকণ্ঠে দাতারাম উত্তর করিলেন, "পারি কি না দেখে নেবেন।"

সুভদ্রার নিকট এক মুঠা আলো চাল চাহিয়া লইয়া পুরোহিত পূজায় বসিলেন।

প্রতিমার গায়ে রঙ্ পড়িয়াছিল, কিন্তু সাজ দেওয়া হয় নাই। সুভদ্রা বলিল, "হাঁ দাদা, মাকে সাজাবে না ?"

দাতারাম বলিলেন, "কি ? ডাকের গয়না দিয়ে ? দূর, দূর! রামপেসাদ কি ব'লেছে জানিস্ ?" বলিয়া দাতারাম গান ধরিলেন,—

"জগৎকে যে সাজায় রে মন! দিয়ে হীরে জহর মুক্তোদানা ;
তুই কোন্ প্রাণে সাজাবি মাকে দিয়ে ছার ডাকের গহনা।"

দাতারাম কতকগুলা স্থলপদ্ম, অপরাজিতা প্রভৃতি আনিয়া প্রতিমা সাজাইতে বসিলেন। সাজান শেষ হইলে দাতারাম ভগ্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ও সুবি! মা কেমন সেজেছে—দেখে যা।"

সুভদ্রা দেখিল, ডাকের সাজ অপেক্ষা ফুলের সাজে মন্দ মানায় নাই, বরং বেশ ভালই সাজিয়াছে M সে ভ্রাতার বাক্যকুণ্ঠতা বিস্মৃত হইয়া, হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল "বেশ সেজেছে দাদা।"

দাতারাম আপনার নৈপুণ্যে আপনি মুগ্ধ হইয়া প্রতিমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "সত্যি সুবি, ঠিক মায়ের মতই দেখাচ্চে।"

৫

সপ্তমীর দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই দাতারাম তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে এক পাল ছেলে আসিয়া জমিয়াছে, তাহাদের আনন্দ-কোলাহলে প্রাঙ্গণ মুখরিত হইতেছে; শারদ সপ্তমীর স্নিগ্ধ প্রভাতালোকে ধরণী যেন হাসিয়া উঠিয়াছে; ঘরে বাহিরে, আকাশে বাতাসে, সর্ব্বত্রই যেন একটা আনন্দের ধারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে; রাস্তা দিয়া নিতাই বৈরাগী এক তারার সুরের সঙ্গে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে,

"উঠ উঠ গিরি, পোহালো শর্ব্বরী,
গৌরী আমার আজি এসেছে।"

দাতারামের বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল।

পুরোহিত তখন পত্রিকা-প্রবেশ করাইয়া প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। দাতারাম প্রতিমার দিকে ফিরিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, প্রতিমার মুখে কি শান্ত মধুর হাসির রেখা! মাটীর পুতুলের মুখে এমন মিষ্ট হাসি এমন আনন্দের ঔজ্জ্বল্য কি থাকিতে পারে? তবে কি গৌরী আজ সত্যই আসিয়াছেন? দাতারামের বুকের ভিতর হইতে কে যেন মুগ্ধ-বিহ্বলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সত্যই কি তুই এসেছিস্ মা?" দাতারাম ভয়ে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্!

পুরোহিত সপ্তমীপূজা শেষ করিলেন। পূজার আরম্ভ হইতে শেষ

পর্য্যন্ত দাতারাম একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিতের গম্ভীরকণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্রগুলা তাঁহার কাণে যেন নূতন সুরে বাজিতে লাগিল। টাকার ঝন্ ঝন্ শব্দ অপেক্ষা জগতে মিষ্ট সুর আর কিছুই নাই, কিন্তু এই অপার্থিব সুরের নিকট সে সুরও বুঝি পরাজিত হয়। দাতারাম প্রতিমার মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই স্বর্গীয় সুর শুনিতে লাগিলেন।

পূজা শেষে দাতারাম অঞ্জলি দিতে বসিলেন। পুরোহিত উদাত্ত গম্ভীর স্বরে অঞ্জলিদানের মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন,—

"ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম।
আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরি মদাশ্রয়ম্।
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরী।
যৎ পূজিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥"

পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্রের আবৃত্তি করিতে করিতে দাতারামের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত, কণ্ঠ গদগদ হইয়া আসিল।

এক রুক্ষকেশ মলিনবসন ভিখারিণী আসিয়া করুণকণ্ঠে ডাকিল, "জয় হোক্ বাবা, কিছু খেতে দাও বাবা!"

পুরোহিত ডাকিলেন, "দাতারাম!"

দাতারাম চমকিয়া উঠিলেন। পুরোহিত বলিলেন, "মা খেতে চাইছেন দাতারাম, মাকে খেতে দাও।"

দাতারাম বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে করিতে ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "এ্যাঁ, মা খেতে চাইছেন? মা কৈ?"

পুরোহিত উঠানের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন।

দাতারাম বলিলেন, "ও তো ভিখারিণী।"

গম্ভীরকণ্ঠে পুরোহিত বলিলেন, "মা আমার বিশ্বরূপিণী, বিশ্বই মায়ের

রূপ দাতারাম। এ মায়ের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি, আর ঐ দেখ মায়ের চিন্ময়ী মূর্ত্তি। মৃন্ময়ী মাকে কিছু খেতে দাও নাই, এবার চিন্ময়ী মা এসেছেন, মাকে খেতে দাও দাতারাম।”

ভিখারিণী বলিল, ”মা এসেছেন, কিছু খেতে দাও বাবা।”

দাতারামের সর্ব্বশরীর ভয়ে বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইল। তিনি রুদ্ধশ্বাসে একবার ভিখারিণীর দিকে, আর বার প্রতিমার দিকে চাহিতে লাগিলেন। দেখিলেন, অন্নপ্রার্থিনী ভিখারিণীর মুখে যে হাসি, ভক্তিপ্রার্থিনী মায়ের মুখেও সেই মৃদু মধুর হাসি! ভিখারিণীর করুণকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছে, “মা এসেছেন, কিছু খেতে দাও দাবা।” মাও যেন তেমনই হাসিমুখে প্রার্থনার সুরে বলিতেছেন, “আমি এসেছি দাতারাম, কিছু খেতে দাও।” দাও দাতারাম, মা খাইতে চাহিতেছেন, বিশ্বরূপিণী মাকে খাদ্য দিয়া তৃপ্ত কর।

দাতারাম উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, “সুবি, সুবি!”

প্রায় শতাধিক ভিখারী উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পশ্চাতে তাহাদের প্রেরক সেই প্রত্যাখ্যাত ছোঁড়ার দল। ভিখারীরা উচ্চকণ্ঠে বলিল, “জয় হোক্ বাবা, কিছু খেতে পাই বাবা।” যেন বিশ্বের অনন্ত কণ্ঠ হইতে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিল, “কিছু খেতে পাই বাবা।”

দাতারাম উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, “সুবি, সুবি!”

সুভদ্রা ছুটিয়া আসিল। দাতারাম কোমরের ঘুন্‌সী হইতে সিন্দুকের-চাবিটা খুলিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন; ব্যগ্রস্বরে বলিলেন, “টাকা নিয়ে আয় সুবি, মাকে খেতে দিতে হবে।”

সুভদ্রা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাতারাম উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, “শীগ্‌গীর যা, তোড়া নিয়ে আসবি। একটা নয়, দু’টো। দু’টো চারটে যা পারিস্—নিয়ে আয়। চিন্ময়ী মাকে খেতে দিতে হবে—আমার এত কালের টাকা জমান সার্থক হবে॥”

সুভদ্রা চাবি কুড়াইয়া লইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। ছোঁড়ার দল বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পুরোহিত প্রতিমার দিকে চাহিয়া যুক্তকরে গদ্‌গদকণ্ঠে পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে!
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
অভক্তভক্তদে চণ্ডি মুগ্ধবোধস্বরূপিণি।
অজ্ঞানজ্ঞানভবনে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

———

মণি

১

কুসীদব্যবসায়ী রামজীবন ঘোষাল মহাশয়কে গ্রাম্য স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক 'শাইলক' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু জানি, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত কথা, এবং অমূলক নিন্দাবাদ মাত্র! কারণ ঘোষাল মহাশয় প্রাপ্য টাকার পরিবর্ত্তে কখনও কাহারও বক্ষোমাংস-গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন না, বরং টাকার জন্য তিনি নিজ দেহের মাংস স্বচ্ছন্দে দান করিতে পারিতেন। অধিক কি কখনও কোন দুঃস্থ খাতক যদি সুদের টাকার পরিবর্ত্তে দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি কোন দ্রব্য দিতে চাহিত ঘোষাল মহাশয় সে সকল কিছুতেই গ্রহণ করিতেন না। তিনি বলিতেন, "বাপু টাকা দিয়াছি টাকা লইব; দুধ ঘি লইয়া পাপের ভাগী হইব কেন?" পাপের ভয়টা ঘোষাল মহাশয়ের এত প্রবল ছিল!

তবে কেহ যদি অর্থের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া কোনও বস্তু দান করিত, ঘোষাল মহাশয় সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা গ্রহণ করিতেন। কেন

না প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের অন্যতম ধর্ম্ম; ইহার প্রত্যাখ্যানে প্রত্যবায় আছে।

তোমরা হয় তো বলিবে, ঘোষাল মহাশয় যে মাঝে মাঝে খাতকের ঘর বাড়ী, থাল ঘটী, গরুবাছুর বেচিয়া লইতেন, সেটা কি ভাল কাজ হইত? আমরা কিন্তু এ জন্য ঘোষাল মহাশয়কে দোষ দিতে পারি না, ন্যায়ধর্ম্মের মর্য্যাদারক্ষার অনুরোধেই তিনি এমন কাজ করিতেন। সংসারে লোক গুলা যেমন কূটবুদ্ধি, তেমনই অকৃতজ্ঞ। তাহারা যখন বিপদে পড়িত, তখন টাকার জন্য ঘোষাল মহাশয়ের হাতে পায়ে ধরিত, দিনে সাতবার হাঁটা হাঁটি করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিত। তারপর খাতায় টিকিট মারিয়াই হউক বা খত লিখিয়া দিয়াই হউক, একবার টাকাটা হস্তগত করিতে পারিলে আর সে পথ দিয়া চলিত না। তাগাদা করিলে, "দিচ্চি, দেব, অজন্মা, খেতে পাই না," এইরূপ কাঁদুনি গাহিয়া ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু সকলেই যদি এইরূপে ফাঁকি দিয়া নিস্তার পায়, তাহা হইলে সংসার হইতে ন্যায়ধর্ম্মটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইবে, পাপের ভরে পৃথিবী রসাতলে যাইবে। অগত্যা পৃথিবীর এই অকালমৃত্যু নিবারণের জন্য ঘোষাল মহাশয়কে মধ্যে মধ্যে অদালতের দ্বারস্থ হইতে হইত।

আদালতে যাওয়া, সেটাও কি কম অধর্ম্মের ভোগ! ঘরের টাকা পরকে দিয়া কে এতটা অধর্ম্মভোগ স্বীকার করে? ঘোষাল মহাশয়কে কিন্তু সে ভোগটা স্বীকার করিতে হইত। কেন না, তাঁহার হৃদয়টা এতই কোমল এবং এমনই দয়াবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত যে কেহ বিপদে পড়িয়া কাঁদাকাটা করিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেন মা। তথাপি সময়ে সময়ে তিনি একটু কঠোর হইতেন, টাকায় দুপয়সা তিন পয়সা, কখনও বা চারি পয়সা সুদের ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করি-

তেন। কিন্তু নাছোড়বান্দা লোক কিছুতেই ছাড়িত না, টাকায় চারি পয়সা সুদ স্বীকার করিয়াও টাকা লইয়া যাইত!

ইহার পর তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়াও যদি সুদ-আসল না পাওয়া যায়, এবং খাতক যদি সুদ দিতে অক্ষমতা জানায়, তবে কোন্ ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি এই সকল অকৃতজ্ঞ মিথ্যাবাদী খাতককে ক্ষমা করিতে পারে?

দুঃখের বিষয় ঘোষাল মহাশয়ের এই কষ্টার্জ্জিত অর্থ ভোগ করিবার উত্তরাধিকারী কেহ ছিল না। উত্তরাধিকারীর আশায় তিনি পর পর দুইটি রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা এমনই অকৃতজ্ঞ যে, দশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার অন্নধ্বংস করিয়া, তাঁহাকে একটিও সন্তান উপহার না দিয়া, নিশ্চিন্ত-মনে পরলোকের পথে যাত্রা করিল। একবারও তাঁহার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিল না, তাহারা চলিয়া গেলে যে তাঁহাকে একমুঠা রাঁধিয়া দিবার পর্য্যন্ত লোক থাকিবেনা, এ কথাটাও একবার ভাবিয়া দেখিল না। হায় রে অকৃতজ্ঞ নারীজাতি!

ঘোষাল মহাশয় এই অকৃতজ্ঞ জাতিটার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, উত্তরাধিকারী না হয় না হউক, না খাইয়া মরিতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি নিয়ত অন্নধ্বংসে নিপুণা এই হৃদয়হীনা জাতিকে আর গৃহে স্থান দিবেন না।

এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া, ঘোষাল মহাশয় পুনরায় দার-পরিগ্রহে বিরত হইলেন। বাটীতে আর স্ত্রী বা পুরুষ অভিভাবক ছিল না। অগত্যা ঘোষাল মহাশয়কে গৃহস্থালীর সকল কার্য্যই সম্পাদন করিতে হইত, স্বহস্তে রাঁধিয়া খাইতে হইত। ইহাতে যে কষ্ট হইত না এমন নহে, কিন্তু সে কষ্ট তিনি বীরের ন্যায় বুক পাতিয়া লইতেন, তাঁহার স্থিরপ্রতিজ্ঞা কিছুতেই বিচলিত হইত না।

২

ঘোষাল মহাশয়ের এই প্রতিজ্ঞাটা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার ন্যায় চিরদিন অচল অটল থাকিত কি না বলা যায় না, কিন্তু প্রতিবেশী যদু চক্রবর্ত্তীর কন্যা মণি আসিয়া একটা গোল বাধাইয়া দিয়াছিল। সেই যে কবে ঘোষাল মহাশয় নাতিনী সম্পর্কে এই দশ বৎসরের মেয়েটীকে কনে সম্বোধনে তাহার সহিত আত্মীয়তার একটু সূত্রপাত করিয়াছিলেন, সেই দিন অবধি মণি এই বয়স্ক-কল্পিত বরটীর একান্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। সে সমবয়স্ক সঙ্গী সঙ্গিনীদিগকে ত্যাগ করিয়া এই পঞ্চাশৎ বর্ষীয় পক্ককেশ ব্যক্তিটীকেই আপনার ক্রীড়া-সঙ্গী করিয়া লইয়াছিল।

অপরে বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেই মণি সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইত, কিন্তু ঘোষাল মহাশয় যখন তাহাকে ক'নে বা গিন্নী বলিয়া ডাকিতেন, তখন সে তাঁহাকে বর বলিয়া সম্বোধন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না।

মণি তাহার কল্পিত বরের গৃহকার্য্যে অনেক সহায়তা করিত। তাহার সাক্ষাতে ঘোষাল মহাশয় কোন গৃহকার্য্য করিতে গেলে, সে তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিত, "ছি, ক'নে থাক্‌তে বর বুঝি ঘরকন্নার কাজ করে? ঘোষাল মহাশয় হাসিতেন, মণি গম্ভীরভাবে আপনার কাজ করিয়া যাইত। ঘোষাল মহাশয় যখন রন্ধন করিতেন, তখন মণি বসিয়া বসিয়া তাঁহাকে রন্ধন-সম্বন্ধে অজস্র উপদেশ দিত। ঝোলে ওই নুণটুকু দাও, অম্বলটা সাতলে নিতে হয়, ভাজাগুলা যে পুড়ে যাচ্ছে, এইরূপ উপদেশ দিয়া এই বয়সেই সে আপনাকে গৃহিণীপণার উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করিয়া একটা গর্ব্ব অনুভব করিত।

পঞ্চাশৎ বর্ষীয় বৃদ্ধের সহিত দশমবর্ষীয়া বালিকার যে প্রণয় জন্মিয়াছিল, এমন কথা বলা যায় না। তবে এই সঙ্গিহীন অসহায় বৃদ্ধের

উপর মণির যে একটা সহানুভূতি জন্মিয়াছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

নারীজাতির উপর সম্পূর্ণ বিরূপ হইলেও ঘোষাল মহাশয় কিছুতেই এই বালিকাটির সংস্রব হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে পারিতেন না। বরং এই বালিকাটী যতক্ষণ কাছে থাকিত, ততক্ষণ তিনি দেনা-পাওনা, সুদের হিসাব, মামলা-মোকদ্দমা সকল বিস্মৃত হইয়া, যেন একটা স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করিতেন, সংসারের কঠোরতা যেন অনেকটা কোমল হইয়া আসিত। বিশেষতঃ পীড়ার সময় যখন তিনি একটা সঙ্গীর অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিতেন, একটু জলের জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেন, সেই সময়ে মণি আসিয়া সুশীতল জলপাত্র তাঁহার মুখের কাছে ধরিত, তাঁহার জ্বর-তপ্ত ললাটে আপনার ক্ষুদ্র কোমল হাতখানি বুলাইয়া শান্তির একটা মধুর প্রলেপ দিত, সে সময় তিনি ভাবিতেন, এই অকৃতজ্ঞ নারীজাতিটার যতই দোষ থাকুক তাদের সেবায় বেশ একটা আরাম পাওয়া যায়।

এমনই করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমে মণি যখন দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল, তখন তাহার পরিপুষ্ট দেহলতা একটা নূতন চাঞ্চল্যের আবেশে অচিরাৎ বসন্তের আগমন সম্ভাবনা জানাইয়া দিল, তখন একটা নূতন আকাঙ্ক্ষা ঘোষাল-মহাশয়ের মনের ভিতর মাঝে মাঝে উঁকি দিতে লাগিল।

৩

"মণি, ও মনোমোহিনি ও গিন্নি!"

"কেন গা বর মশায়?"

"বলি আজ যে বুড়োটাকে একেবারেই ভুলে গেলে?"

মণি স্বীয় গণ্ডদেশে করতল সংন্যস্ত করিয়া অতিমাত্র বিস্ময়ের স্বরে বলিল, "ও মা, এ কি কথা! তুমি বুড়ো? কে তোমায় বুড়ো বলে?"

"বলে এই পাঁচ শালায়।

"তাদের কি চোখ নাই?"

"তা থাক্‌লে কি তা'রা এই এক কুড়ি পার না হ'তেই চোখে চসমা আঁটে? আর দেখ না, আমি আড়াই কুড়ি পার হয়েও চসমার ধার ধারি না। তবু বলে আমি বুড়ো।" এই বলিয়া ঘোষাল মহাশয় হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। মণিও হাসিতে হাসিতে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দুপরবেলা এত কাগজ পত্তর নিয়ে বসেছ কেন? এ সব কিসের কাগজ?"

ঘোষাল। এগুলা দেনা-পাওনার কাগজ। শিবে ময়রা আজ সুদ দিয়ে গেল, তারই জমা খরচ কর্‌ছি।

মণি। আর এই ছোট কাগজগুলা?

ঘোষাল। ও গুলা নোট, ওর এক একখানার দাম দশ টাকা।

মণি। ক'খানা নোট আছে দেখি। এক, দুই, তিন, চার পাঁচ, ছ'খানা। তাহ'লে কত টাকা হ'লো?

ঘোষাল। ষাট টাকা—তিন কুড়ি।

মণি বিস্মিত হইয়া বলিল, "ওঃ তোমার এত টাকা দাদামশায়?"

ঈষৎ হাসিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন "এ আর ক'টা টাকা রে পাগলি?"

মণি। আরও টাকা আছে না কি?

ঘোষাল। আছে বৈ কি। দেখ্‌বি?

মণি সাহ্লাদে বলিয়া উঠিল "দেখ্‌ব।"

"তবে আয়" বলিয়া ঘোষাল মহাশয় চাবির গোছটা লইয়া সিন্ধুকের কাছে গেলেন, এবং সিন্ধুক খুলিয়া মণিকে ভিতরে দেখিতে বলিলেন। প্রথমটা একটু অন্ধকার বোধ হইল, ক্ষণপরেই মণি দেখিল, ওঃ অত

টাকা! থাকে থাকে সাজান কত নোট! সারি সারি তোড়াবন্দি টাকা! মণি তাহার একটা তুলিতে গেল, কিন্তু পারিল না। তখন সে বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ঘোষাল মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দাদামহাশয় তোমার এত টাকা।"

মৃদু হাসিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আবার এদিকে দেখ।"

মণি সবিস্ময়ে সে দিকে চাহিল। দেখিল, একটা বড় বোকনোর মধ্যে সোণা রূপার কত গহনা! সে অলঙ্কার-রাশির ঔজ্জ্বল্যে মণির চক্ষু যেন ঝলসিয়া যাইতে লাগিল! সে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে অলঙ্কার-রাশির দিকে চহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এত গহনা কার দাদামশায়?"

ঘোষাল। ও সব বন্ধকী গহনা, এখন আমারই। আয় তোকে পরিয়ে দিই।

তখন সেই অলঙ্কারের পাত্র বাহির করিয়া ঘোষাল মহাশয় তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলা গহনা মণিকে পরাইয়া দিলেন। স্বর্ণাভরণে ভূষিত হইয়া মণি যেন সত্যই মনোমোহিনী হইয়া দাঁড়াইল। ঘোষাল মহাশয় দেখিলেন এতদিন সিন্ধুকরূপ অন্ধকারায় অবরুদ্ধ অলঙ্কার-গুলার আজ যেন অলঙ্কার জন্ম সার্থক হইল।

তারপর মণি এক এক করিয়া গহনাগুলি খুলিয়া দিল; ঘোষাল মহাশয় তাহা যথাস্থানে রক্ষা করিয়া সিন্ধুক বন্ধ করিলেন।

মণি জিজ্ঞাসা করিল "এ সব গহনা কা'কে দেবে দাদামশায়?"

"আমার গিন্নীকে!"

ঘোষাল মহাশয় সোৎসুক-দৃষ্টিতে মণির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মণি মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। ঘোষাল মহাশয় ভাবিলেন, "এমন ভাগ্য কি আমার হবে?"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ঘোষাল মহাশয় দেখিলেন ভাগ্যটা তাঁহার

আয়ত্তের নিতান্ত বাহিরে নয়; একটু চেষ্টা করিলেই হয়তো তাঁহার আশা-বৃক্ষে সুফল ফলিতে পারে।

ঘোষাল মহাশয় পুনরায় সিন্ধুক খুলিয়া একটা কাগজের দপ্তর বাহিরে আনিলেন এবং এটা সেটা খুঁজিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানা রেজেষ্টারী তমশুক বাহির করিলেন। সেখানা যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর প্রদত্ত। যদুনাথ একবার মাতৃশ্রাদ্ধের সময় একশত টাকা এবং আর একবার অজন্মার বৎসরে একশত তের টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ঋণ শোধ করিতে না পারায়, কিছুদিন পরে সুদ ও আসল একত্র করিয়া তিনশত তেত্রিশ টাকার একখানা তমশুক লিখিয়া দিয়াছিল।

ঘোষাল মহাশয় একখান পৃথক কাগজে সন মাস হিসাব করিয়া সুদ কষিয়া দেখিলেন, সুদে আসলে মোট চারিশত পঞ্চান্ন টাকা সাত আনা পাওনা হইয়াছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি তমশুকখানাকে বাক্সের ভিতরে পৃথক করিয়া রাখিয়া দিলেন।

৪

ঘরে তের বছরের মেয়ে। সুতরাং যদুনাথের আহার নিদ্রা নাই। আজ দুই বৎসর ধরিয়া তিনি পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু মনোমত পাত্র মিলিতেছে না। পাত্র মিলিলেও অর্থ সামর্থ্যে কুলাইয়া উঠে না। অগত্যা অল্প ব্যয়ে একটী মনোমত পাত্র খুঁজিতে খুঁজিতে মণি ত্রয়োদশে পদার্পণ করিল। সমাজ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিল, প্রতিবেশিনীরা ছি ছি করিতে লাগিল, যদুনাথ পাত্রের অন্বেষণে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটছুটি করিয়া দুই জোড়া জুতা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, তথাপি পাত্র মিলিল না।

অনেক ছুটাছুটি হাটাহাটির পর যদুনাথ যে দিন একটি পাত্র স্থির

করিয়া আসিলেন, সেই দিন সন্ধ্যার সময় চিন্তামণি ঘটক আসিয়া ঘোষাল মহাশয়ের পুনরায় দার পরিগ্রহের ইচ্ছা প্রকাশ করিল, এবং মণিই যে তাঁহার যোগ্যপাত্রী ইহাও সংক্ষেপে জানাইয়া দিল। কিন্তু যদুনাথ এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। তখন চিন্তামণি তাঁহাকে বিশেষ-রূপে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিল যে, এই বিবাহে সকল দিকেই মঙ্গল। ইহাতে সম্মত হইলে তাঁহার এক পয়সাও খরচা হইবে না, অধিকন্তু তিনি ঋণের গুরুভার হইতে মুক্তি পাইবেন M, মেয়েও সুখে থাকিবে; গ্রামে ঘোষাল মহাশয়ের মত অর্থ আর কাহার আছে! আর পাত্রীর অভাব কি? হরগঞ্জের জয়রাম গাঙ্গুলীর চৌদ্দ বৎসরের মেয়ে; সে হাত ধোয় না। নিশ্চিন্তপুরের সর্ব্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী পঞ্চাশ টাকা ঘটক বিদায় দিতে প্রস্তুত। কিন্তু ঘটক মহাশয় যদুদাদার একান্ত শুভানুধ্যায়ী, এই জন্য তিনি সেই সকল প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া যদুদাদাকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন।

পরে ঘটক মহাশয় যদুনাথের গা টিপিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দাদা বুঝছ না, ভবিষ্যতে এ সবই তোমার। একবার গিন্নির সঙ্গে পরামর্শ করে দেখ।

কিন্তু যদুনাথ পরামর্শের অপেক্ষা করিলেন না। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন,—খুড়ার ভীমরথীর বয়স হয়েছে কিন্তু আমার এখনও সে বয়স হয় নাই। আর ওরূপ টাকায় আমি—ইত্যাদি।"

ঘটক মহাশয় তখন হতাশচিত্তে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ঘোষাল মহাশয়ের নিকট সকল কথা সালঙ্কারে নিবেদন করিল। শুনিয়া ঘোষাল মহাশয়ের চোখ দুটা লাল হইয়া উঠিল। ঘটক আশ্বাস দিয়া বলিল, "আপনি ভাবিবেন না। অনুমতি করুন কালই অপ্সরীর মত চৌদ্দ বছরের মেয়ে এনে দিচ্ছি। চক্রবর্ত্তী বেটার থোতা মুখ ভোতা হয়ে থাক।"

কিন্তু ঘোষাল মহাশয় তাহাতে রাজি হইলেন না, পরে দেখা যাবে বলিয়া ঘটককে বিদায় দিলেন।

পরদিন অতি প্রত্যূষে ঘোষাল মহাশয় যদুনাথের তমশুক ও কয়েকটি টাকা লইয়া মহুকুমা যাত্রা করিলেন M.

৫

"মণি, ও মনোমোহিনী, তোর নাকি বিয়ে?

"শুন্‌ছি ত তাই।"

"কবে? কোথায়?"

মণি তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা গণ্ডদেশ স্পর্শ করিয়া বলিল, "ওমা, তুমি তা জান না? বলে, যার বিয়ে তার মনে নাই।"

ঘোষাল মহাশয় ঈষৎ বিষাদপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "আর দিদি, এখন কি আর এই বুড়োকে মনে ধর্‌বে?"

মণি যেন অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুমি তো বেশ লোক দাদামশায়? এতকাল আশা দিয়ে শেষে সময় কালে পেছিয়ে দাঁড়াও।"

মৃদু হাসিয়া ঘোষাল মহাশয় উত্তর করিলেন, "সাধে কি পেছিয়ে দাঁড়াই? এই বয়সে এমন রত্ন নিয়ে শেষে কি পাঁচশালার চক্ষু শূল হয়ে দাঁড়াব?"

মণি বলিল, "তা তুমি হও হবে, আমার কিন্তু সে ভয় একটুও থাক্‌বে না।"

ঘোষাল মহাশয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মণি ঝাঁটা গাছটা তুলিয়া লইয়া উঠান ঝাট দিতে প্রবৃত্ত হইল।

মানুষ চিরদিনই মানুষ। সময় বিশেষে স্থান কাল পাত্রভেদে তাহার হৃদয় বজ্র হইতেও কঠোর হইতে পারে, প্রকৃতি শার্দ্দূল অপেক্ষা ভীষণ-

ভাব ধারণ করিতে পারে, কুৎসিত আচরণে পিশাচও তাহার নিকট পরাজিত হয়। কিন্তু সময় বিশেষে স্থান বিশেষে, তাহার সেই কুলিশ-কঠোর হৃদয় কুসুম অপেক্ষা কোমল হইয়া পড়ে, ভীষণ শার্দ্দূল প্রকৃতিতে মমতার স্নিগ্ধস্রোত বহিয়া যায়, পৈশাচিক চরিত্রে অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য দেব-ভাব বিকশিত হইয়া উঠে। যত নীচ, যত অধম, যত ঘৃণিত হউক না কেন, মানুষ চিরদিনই মানুষ।

যদুনাথের উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ এবং তাহার সর্ব্বনাশে সমুদ্যত হইলেও ঘোষাল মহাশয় কিন্তু মণির নিকট আপনাকে স্থির রাখিতে পারিতেন না। সেই চঞ্চলা বালিকা অঙ্গে কৈশোরের সম্পূর্ণতা লইয়া মুখে প্রীতির মোহন রাগ মাখিয়া স্বরে বসন্তের মধুর আহ্বান জাগাইয়া যখন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে ডাকিত "দাদা মশায়" তখন সে আহ্বান তাঁহার মর্ম্মের প্রতিতন্ত্রীতে গিয়া প্রহত হইত, তাঁহার প্রতি-হিংসাপ্রবণ হৃদয় একটা অজ্ঞাত মোহে মুহূর্ত্তের জন্য অবসন্ন হইয়া পড়িত, তিনি বর্ত্তমানের স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেন।

তারপর মণি চলিয়া গেলে তাঁহারা জাগ্রৎ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইত। তিনি ভাবিতেন, "হায়! জীবনের ম্লান অপরাহ্ণে আবার ঊষার আলোক দেখা দেয় কেন? পারঘাটে যাত্রার সময় মণি পাছু হইতে ডাক দিল কেন? যদি ডাকিল, তবে পশ্চাতে ফিরিয়া আর তাহাকে পাইলাম না কেন? অন্ধকারময় জীবন-সন্ধ্যাকে গভীরতর অন্ধকারে ঢাকিয়া দিয়া সে এমন করিয়া পালাইল কেন?"

ভাবিতে ভাবিতে ঘোষাল মহাশয়ের হৃদয় নৈরাশের দারুণ আঘাতে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িত, বুকের ভিতর প্রতিহিংসার আগুন ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিত। সে আগুনে হতভাগা যদু চক্রবর্ত্তীকে দগ্ধ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ উন্মাদ হইয়া উঠিত।

৬

সেদিন মণির বিবাহ। তখন সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে, উষার সুবর্ণ-ছটা বৃক্ষাগ্র রঞ্জিত করিয়া সবে মাত্র উৎসব-প্রাঙ্গণে পতিত হইয়াছে দ্বারে রোসনচৌকীর সানাই বিভাষের ললিত তান তুলিয়া মিলনোৎ-সবের আনন্দবার্ত্তা আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া দিতেছে। এমন সময় সহসা দ্বিতীয় রাহুগ্রহের ন্যায় আদালতের পেয়াদা তথায় আবির্ভূত হইয়া, উৎসবের আনন্দজ্যোতি ম্লান করিয়া দিল।

ঘোষাল মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই মোকদ্দমা এক তরফা ডিক্রী করাইয়া রাখিয়াছিলেন। তার পর সময় বুঝিয়া ডিক্রী জারি করিয়া অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোকী পরোয়ানা বাহির করিলেন। পাছে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধে এই আশঙ্কায় কোর্টে দরখাস্ত করিয়া পুলিশ হইতে একজন কনেষ্টবল লইলেন। পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে পেয়াদা ও কনেষ্টবল রাত্রিকালে তাঁহার বাটিতে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে চর্ব্ব্যচূষ্যরূপে ভোজন করাইয়া এবং ভবিষ্যতের যথাযথ দক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া প্রভা-তেই যদুনাথের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

চৌকীদার কনেষ্টবল সমভিব্যাহারে অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোকী পরোয়ানা হস্তে সহসা পেয়াদার আবির্ভাব দেখিয়া যদুনাথ প্রমাদ গণিল, পুরোনারীরা হায় হায় করিয়া উঠিল, সানায়ের ললিত তান অন্তরার অর্দ্ধ পথে না যাইতেই থামিয়া গেল।

যদুনাথের এই আকস্মিক বিপদের সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। পাড়ার অনেক লোক আসিয়া সমবেত হইল। তাহাদের কেহ যদুনাথের বিপদে দুঃখ প্রকাশ করিল, কেহ ঘোষাল মহাশয়কে গালি দিল, কেহ বা মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। কেহ উপদেশ দিল, "কোর্টে গিয়া ক্রোক রদের দরখাস্ত কর।" কেহ বলিল "পাঁচ জনে ঘোষাল মহাশয়কে

ধরিয়া নিরস্ত কর।” যাহার দেহে ক্ষমতা আছে, সে বলিল, “মারিয়া তাড়াইয়া দাও।”

যদুনাথ কিন্তু এ সকল উপদেশের একটাও সারবান্ বলিয়া মনে করিতে পারিল না ; সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বিপদে মধুসূদনকে স্মরণ করিতে লাগিল। এ দিকে ঘোষাল মহাশয় পেয়াদাকে পাঠাইয়া দিয়া, স্বয়ং তথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া ঘরে চাবি দিয়া দুর্গা-স্মরণপূর্ব্বক তিনি বাহির হইলেন। কয়েক পদ অগ্রসর হইবামাত্র পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, “দাদামশায় ? পাছু ডাকায় ঘোষাল মহাশয় একটু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু মণির মুখের দিকে চাহিতেই তাহার সে বিরক্তিটুকু দূর হইয়া গেল। মণি ডাকিল, “দাদামশায় !”

“কেন মণি ?”

“এ সব কি দাদামশায় ?”

“কি মণি।”

বৃদ্ধের মুখের উপর তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মণি বলিল, “তোমার এমন কাজ ?”

বালিকার সেই তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে ঘোষাল মহাশয় যেন এতটুকু হইয়া গেলেন। কি উত্তর করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না।

মণি আবার ডাকিল, “দাদামশায় !”

“কেন মণি।”

“তুমি কি বাবাকে রক্ষা করতে পার না ?”

ঘোষাল মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন। মণি বলিল, “পার কি না তাই বল।”

“পারি, যদি আমি যা চাই তা পাই।”

“তুমি কি চাও ?”

"আমি তোকে চাই।

"বেশ, আমায় পাবে।"

বিস্ময়-বিজড়িত কণ্ঠে ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোকে কেমন ক'রে পাব মণি?"

মণি বলিল, "যেমন ক'রে পেতে চাও।"

উৎফুল্ল কণ্ঠে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আমি তোকে বিয়ে কর্‌তে চাই। আমাকে বিয়ে করবি?"

মণি স্থিরস্বরে উত্তর করিল, "হাঁ, বাবাকে বাঁচাবার জন্য তোমায় বিয়ে কর্‌ব।"

"কেবল বাপকে বাঁচাবার জন্য?"

"হাঁ, কেবল বাবাকে বাঁচাবার জন্য।"

"আমার কত টাকা, কত গহনা আছে দেখেছিস্?"

"দেখেছি। কিন্তু টাকা গহনার ভিতরে কতটুকু সুখ থাকে দাদামশায়?"

মণির মুখে শ্লেষের হাসি দেখিয়া ঘোষাল মহাশয় মরমে মরিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "তা হ'লে বাপের জন্য তুই নিজের সুখ ত্যাগ কর্‌বি?

"হাঁ।"

"কিন্তু তোর বাপ মত দেবে না।"

"আমি বল্‌লেই মত দেবেন। এখন তোমার মত কি বল!"

"আমার মত? তোকে পেলে মণি আমি হাতে স্বর্গ পাই। কিন্তু—না, তুই এখন ঘরে যা, আমি একটু ভেবে দেখি।"

মণি চলিয়া গেল। ঘোষাল মহাশয় সেইখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। একসঙ্গে অনেকগুলা চিন্তা আসিয়া তাঁহার মনের ভিতর একটা ঝড় তুলিয়া দিল। যে মণির জন্য তিনি উন্মাদ, সেই মণি আজ তাঁহার হস্তগত, অমরার দৃঢ়রুদ্ধ দ্বার আজ তাঁহার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত। কিন্তু মণি

তাঁহাকে একি শিক্ষা দিয়া গেল ? ক্ষুদ্র বালিকা পিতার জন্য জীবনের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, আর তিনি এই বয়সে আত্মসুখের জন্য একটি বালিকাকে কামনার অনলে ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত; তাঁহার অর্থ আছে; কিন্তু অর্থে কি যথার্থ সুখ পাওয়া যায় ? তিনি তো অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন; কিন্তু সুখ কোথায় ? জীবনের সাফল্য কৈ ? অর্থে সুখ থাকিলে তিনি আবার অন্য উপায়ে সুখ লাভের জন্য এত লালায়িত কেন ? ভগবান্! এ বয়সে আর কেন ? আমাকে সুখের পথ দেখাইয়া দাও, কামনার ধ্বংস করিয়া দাও!

ঘোষাল মহাশয় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সিন্দুক খুলিয়া একটা ছোট পুঁটুলি হাতে লইয়া বাহিরে আসিলেন।

(৭)

ঘোষাল মহাশয় যখন যদুনাথের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, তখন সেখানে অনেক লোক জমিয়াছিল; অনেকেই ঘোষাল মহাশয়ের এই নীতি-বিগর্হিত কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া পরলোকে তাঁহার একটা ভয়ানক স্থানে বাসের সম্ভাবনা জানাইতেছিল। কিন্তু বৃদ্ধের উপস্থিতি মাত্রেই সকলে তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিল। কেননা তাহাদের অনেকেই বৃদ্ধের নিকট অল্প বিস্তর ঋণগ্রস্ত।

ঘোষাল মহাশয় ভিড় ঠেলিয়া পেয়াদার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কি গো প্যাদা সাহেব, বসে বসে ভাবছ কি ?"

পেয়াদা বলিল, "মশাই আজ বাড়ীতে বিয়ে।"

ভ্রূকুটী করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "ভাগ্যে বাপু কথাটা আমায় শোনালে ? বিয়ে বাড়ীতে কিছু জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছে কি ?"

পেয়াদা একটু গরম হইয়া বলিল,, "মশাই, সরকারী চাকর হলেও আমি মানুষ। আজকের দিনে এমন কাজটা করা কি ভাল?"

শ্লেষের হাসি হাসিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "বাপু, তুমি এক কাজ কর, এই ব্যাগ আর চাপরাশ ফেলে একটা টোল খুলে ফেল; বেশ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিতে পারবে।"

যদুনাথ আসিয়া ঘোষাল মহাশয়ের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "রক্ষা কর খুড়ো, রক্ষা কর। আজকার দিন বাদে আমার ঘর বাড়ী সব বেচিয়া লও, আমাকে জেলে দাও। কিন্তু আজ রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমার জাতি ধর্ম্ম সব যায়।"

পা ছাড়াইয়া লইয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "কিছুই যাবে না বাবাজী কিছুই যাবে না, সব বজায় থাকবে। তোমার মেয়ে আমায় বিয়ে করতে রাজি।"

যদুনাথ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এঁ্যা, আমার মেয়ে!"

ঘোষাল মহাশয় সহাস্যে বলিবেন, "হাঁ, তোমার মেয়ে—মণি।"

ঘোষাল মহাশয় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "মণি, মণি!"

বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মণিও সেখানে ছিল। ঘোষাল মহাশয়ের আহ্বানে সে ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মণি, আমাকে বিয়ে করতে তুই রাজি?"

মণি মুখ নিচু করিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "ঘাড় নাড়লে হবে না। সোজা কথায় তোর বাপকে শুনিয়ে বল্ রাজি কি না।"

মণি দুই তিনটা ঢোক গিলিয়া বহু কষ্টে জড়িতকণ্ঠে বলিল, "হাঁ রাজি।"

সমবেত জনমণ্ডলীর কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইল। ঘোষাল মহাশয় সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া হাতের পুঁটুলিটী খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "তবে মণি, এই গয়নাগুলো পর্। আমার ক'নে কখন আজ এমন খাঁলি গায়ে থাক্‌তে পারে না।"

ঘোষাল মহাশয় স্বহস্তে এক একখানি করিয়া গহনা মণিকে পরাইয়া দিলেন। সেই সকল বহুমূল্য অলঙ্কার দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। ঘোষাল মহাশয় প্রসন্ন দৃষ্টিতে মণির স্বর্ণালঙ্কারদীপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া যদুনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি বাবাজি, তোমার পছন্দসই জামায়ের সাত পুরুষে কখনও এমন গয়না চোখে দেখেছে?"

যদুনাথ দুই হাতে মাথা টিপিয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল।

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "একটা দোয়াত কলম—শিগ্‌গীর একটা দোয়াত কলম দাও। মণি, তুই আর একটু দাঁড়া। তুই চ'লে গেলে আমার সব গোলমাল হয়ে যাবে।"

এক জন ছুটিয়া গিয়া দোয়াত কলম আনিয়া দিল। ঘোষাল মহাশয় পেয়াদার হাত হইতে ডিক্রীর কাগজখানা লইয়া তাহার পৃষ্ঠে লিখিলেন, "দাবীর সমস্ত টাকা বুঝিয়া পাইলাম।" তাহার নীচে নিজের নাম সহি করিয়া কাগজখানা যদুনাথের হাতে দিলেন। যদুনাথ সেখানা মাটীতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "তা" হবে না খুড়ো, প্রাণ থাক্‌তে আমি মণিকে তোমার হাতে দেব না। খুড়ো, আমার সর্ব্বস্ব লও, কিন্তু মণিকে——

ঘোষাল মহাশয় পা ছিনাইয়া লইয়া ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, "চুপ কর্ বেয়াদব; তোর মত নেমকহারামের মেয়েকে রামজীবন ঘোষাল বিয়ে করে না। তুই এখন মণিকে যার হাতে ইচ্ছা দিতে পারিস্। কিন্তু

সাবধান, শাঁখের শব্দ যেন আমার কানে না যায়। এস প্যায়াদা সাহেব।”

ঘোষাল মহাশয় ভিড় ঠেলিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া প্রস্থান করিলেন। স্তব্ধ জনমণ্ডলী বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল। রুদ্ধকণ্ঠ সানাই আবার নূতন সুরের তরঙ্গ তুলিয়া গাহিয়া উঠিল,—

‘আপনা বলিতে যা ছিল হামারি
সব দিনু তুয়া পায়।’

উত্তরাধিকারী।

(১)

ময়রার মেয়ে কাদী মুড়ি-মুড়কি বেচিয়া যখন হাতে দু'পয়সার সংস্থান করিল, তখন সে এই দু'পয়সার উত্তরাধিকারীর জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

ভরা যৌবনে স্বামীর মুখাগ্নি করিয়া কাদী যে দিন কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিল, সে দিন সে একবারও মনে করে নাই যে, তাহাকে আবার সংসারে থাকিতে হইবে এবং মুড়ি-মুড়কি বেচিয়া দিন গুজরান করিতে হইবে। কিন্তু সে যাহা মনে করে নাই, কিছু দিন পরে কাজে তাহাই করিতে হইল। শূন্য সংসারে তাহাকে থাকিতে হইল এবং মুড়ি-মুড়কির দোকান করিয়া সেখানে থাকিবার উপায় করিতে হইল।

গাঁয়ের বাজার-পাড়ায় হরিদাস বেজের মেঠায়ের দোকান ছিল। দোকানখানার বেশ চল্‌তি ছিল, কিন্তু হরিদাসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহা অচল হইয়া পড়িল। মহাজন পাঁচ বৎসরের খাতার জের টানিয়া দুই

শত তেত্রিশ টাকা সাত আনা তিন পাই বাকী করিল। কাদম্বিনী দোকানের মজুত মালপত্র, হাঁড়ি-কলসী পর্য্যন্ত বেচিয়া স্বামীকে ঋণমুক্ত করিয়া দিল। জ্ঞাতি সম্পর্কে ভাসুর মদন বেজ আসিয়া বলিল, "তুমি কি ক্ষেপেছ বৌমা, ও সব মহাজনের চাতুরী। আমার হাতে দোকানটা দাও, দেখি কোন্ বেটা একটা পয়সা আদায় করে।"

কাদম্বিনী কিন্তু সে কথা কাণে তুলিল না। দোকান বেচিয়া স্বামীকে ঋণমুক্ত করিল, তারপর গলার মুড়কি-মাদুলী বেচিয়া তিল-কাঞ্চনে স্বামীর পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিল। মদনের মনঃক্ষোভের সীমা রহিল না, কিন্তু এই ক্ষোভ-নিবারণের কোন উপায়ই সে খুঁজিয়া পাইল না। কেবল দুই বেলা মালা জপের সময় শ্রীহরির চরণে আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়া এই অধর্ম্মের প্রতীকার প্রার্থনা করিতে লাগিল।

স্বামীর শ্রাদ্ধাদি কার্য্য শেষ করিয়া কাদম্বিনী যখন আপনাকে নিতান্ত অসহায় জ্ঞান করিল এবং জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের কোন উপায়ই দেখিতে পাইল না, তখন সে ভাসুর মদন বেজের শরণাপন্ন হইল। মদন কিন্তু তাহাকে আমল দিল না; সে বারংবার দীনবন্ধু শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে করিতে অপরের প্রতিপালনে আপনার সম্পূর্ণ অক্ষমতা জানাইয়া দিল। কাদম্বিনী দেখিয়া চলিয়া গেলে, মদন গৃহিণীর দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য সহকারে বলিল, "দেখ্‌লে মাগীর আক্কেলটা। এখন হয়েছে কি?" 'আগে না শুনিলে বঁধু যৌবনের ভরে, এখন কাঁদিতে হবে অজ্‌ঝর ঝরে।' মধুসূদন আছেন।"

এ দিকে কাদম্বিনী আরও দুই এক জন স্বজাতির দ্বারস্থ হইয়া যখন প্রত্যাখ্যাত হইল, তখন সে ভজা চাঁড়ালের মার পরামর্শে আপনার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবার সঙ্কল্প করিল। সে মল ও রূপার পৈছে বেচিয়া মুড়ি-মুড়কির দোকান করিল। বাড়ীর পাঁচীলের গায়েই একটু

চালা বাড়াইয়া লইয়া দোকান খুলিল। ভজার মা বাজার হইতে চাল, ধান, গুড় প্রভৃতি মালপত্র আনিয়া দিত; কাদী ঘরে বসিয়া মুড়ি-মুড়কি তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করিত M.

দোকান বেশ চলিল, কাদম্বিনীর জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হইল। কিন্তু সে আর এক দিকে বড়ই অসুবিধা বোধ করিল।

কাদম্বিনী ভরা যৌবনেই বিধবা হইয়াছিল। দেখিতেও সে মন্দ ছিল না। সুতরাং পাড়ার অনেক নিষ্কর্ম্মা ছোঁড়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার দোকানে আড্ডা জমাইয়া থাকিত। সে আড্ডায় গান গল্প, হাসি-তামাসা, সব রকমই চলিত। কাদম্বিনী ভয় পাইত, কিন্তু সাহস করিয়া মুখের উপর কাহাকেও কিছু বলিতে পারিত না।

শেষে ব্যাপার এমন গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, কাদম্বিনী ভজার মাকে আপনার অসুবিধার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। ভজার মা চাঁড়ালের মেয়ে, একরোখা, কাহাকেও ভয় করিয়া চলে না। সে একদিন ছোঁড়ার দলকে এমন কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিল যে, তাহারা আর দোকানের ত্রিসীমানায় আসিতে সাহস করিল না। কাদম্বিনী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ছোঁড়ার দল কিন্তু সহজে ছাড়িল না। সেই দিন হইতে প্রতি রাত্রিতে কাদম্বিনীর বাড়ীতে ইট-পাটকেল পড়িত, দরজার শিকল নড়িত, জানালার বাহিরে শীষের শব্দ শুনা যাইত। কাদী ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকিত, বিপদে মধুসূদনকে স্মরণ করিবার শক্তিও তাহার থাকিত না। লোকে শুনিয়া বলিত, "এ সব উপদেবতার কাজ। হরিদাস যে বারদোষ পেয়েছিল।"

কাদম্বিনী পুরোহিতকে আনাইয়া বারদোষের শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইল, কিন্তু ভূতের উপদ্রব থামিল না। ভজার মা বলিল, "মর্ ছুঁড়ি, এ সব ভূত কি ফুলতুলসীতে যায়? এ ভূতের আলাদা ওষুদ।"

ভজার মা স্বতন্ত্র ঔষধের ব্যবস্থা করিল। সে নিজে ঘর-দোর, ছেলে-পিলে ফেলিয়া শুইতে আসিতে পারিল না, ভজাকে পাঠাইয়া দিল। যে দিন হইতে ভজা কাদম্বিনীর ঘরের দাবায় চাটাই পাতিয়া, পাকা বাঁশের লাঠি পাশে রাখিয়া শুইতে আরম্ভ করিল, সেই দিন হইতে ভূতের উপদ্রব থামিয়া গেল।

(২)

ভূতের উপদ্রব কমিল, কিন্তু মানুষের জিহ্বার উপদ্রব বাড়িয়া গেল। প্রবীণারা নাক সিট্‌কাইয়া ছি ছি করিতে লাগিল, নবীনারা মুখ মুচ্‌কাইয়া মৃদু হাসিল; মদন বেজ হাতের মালা দ্রুত ঘুরাইতে ঘুরাইতে গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ্‌লে গিন্নি, ভাগ্যে জায়গা দিই নাই। ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন।"

গৃহিণী মুখ ঘুরাইয়া "অমন সোমত্ত ছুঁড়ীকে কি ঘরে ঠাঁই দিতে আছে? ছি ছি, আবাগী কি লোকটাই হাসালে?"

কাদম্বিনীর কাণেও অনেক কথা গেল, কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য করিল না। ভাবিল, "লোকে যা বলুক না, আমি তো ঠিক আছি। কাদম্বিনী জানিত না যে, লৌকিক তুলাদণ্ডে ঠিক-বেঠিকের ওজন সব সময়ে সমানভাবে হয় না।

এ কথাটা কাদম্বিনী সেই দিন কতকটা বুঝিতে পারিল—যে দিন পুরোহিত তাহার ঘরে লক্ষ্মীপূজা করিবে না বলিয়া জবাব দিয়া গেল। কাদম্বিনী পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার অপরাধ?"

পুরোহিত উত্তর করিলেন, "তোমার অপরাধ গুরুতর; তুমি চাঁড়ালের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়েছ।"

কাদ। চাঁড়ালের ছেলের সঙ্গে আমার কোন মন্দ সম্বন্ধ নাই; সে আমাকে মায়ের মত দেখে, আমি তাকে ছেলের মত দেখি।

পুরো। কে কাকে কি ভাবে দেখে, কেমন ক'রে জান্‌ব বল? আমরা তো অন্তর্যামী নই?

কাদ। তবে মন্দ দিক্‌টা কি রকমে জান্‌লেন?

পুরো। অনুমানে। ধোঁয়া দেখ্‌লেই বুঝা যায় যে, আগুনও আছে।

কাদম্বিনী একটু রাগত ভাবে বলিল, "তা হ'লে আমার ধর্ম্ম রক্ষা করাও দোষ হয়েছে বলুন?"

পুরোহিত মস্তক সঞ্চালনে দীর্ঘ শিখা কম্পিত করিয়া অবিচলিতভাবে উত্তর করিলেন, "এ ভাবে ধর্ম্ম রক্ষা করার চেয়ে অধর্ম্ম করাও ছিল ভাল।"

কাদম্বিনী রাগে পূজার উপকরণ ছড়াইয়া ফেলিয়া বলিল, "যান আপনি, আমার আর পূজোর দরকার নাই।"

পুরোহিত চলিয়া গেলেন; কাদম্বিনী পূজার জিনিষপত্র সব কুড়াইয়া লইয়া জলে ফেলিয়া দিয়া আসিল।

ভজার মা আসিয়া বলিল, "হাঁ লা ময়রা-বৌ, রায় ঠাকুর না কি তোর পূজো বন্ধ করেচে?"

ঔদাস্যের সহিত কাদম্বিনী বলিল, "করুক্ বোন, আমার তো সাত দিকে সাতটা ছেলে-মেয়ে জ্বল্-জ্বল্ কর্‌ছে যে, পূজো না হ'লে তাদের অকল্যাণ হবে।"

ভজার মা রাগিয়া বলিল, "তা হোক্ আর নাই হোক্, ও বামুন তোর পূজো বন্ধ করে কোন্ লজ্জায়? ভগী তাঁতিনীর কথা কি কেউ জানে না?"

কাদম্বিনী বলিল, "মরুক্ গে, আমরা গরীব-দুঃখী লোক, আমাদের অত কথায় দরকার কি? যে কাঠ খাবে, সে আঙ্গরা হাগ্‌বে।"

ভজার মা মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "ইঃ লো, 'চালুনী বলে ছুঁচ তোর' তাই আর কি। বামুনের একবার দেখা পেলে হয়, এমন তো শুনিয়ে দেব নি।"

পরদিন বাজারে যাইবার পথে ভজার মা রায় ঠাকুরের সাক্ষাৎ পাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "হাঁ গা রায় ঠাকুর, ভুগী না কি বিন্দাবনে যাবে ?"

মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে রায় ঠাকুর বিচলিত-স্বরে বলিলেন, "ভজার মা, ভজার জন্যে একখানা ভাল গামছা বেছে রেখেছি, নিয়ে যাস্।"

ভজার মা মাথা নাড়িতে নাড়িতে সহাস্যে বলিল, "তা আন্‌বো বৈকি বাবাঠাকুর, আমরা তো তোমাদের খেয়েই মানুষ। তবে কি না, ময়রা-বৌ বল্‌ছিল যদি যায়—"

ব্যস্তভাবে রায় ঠাকুর বলিলেন, "আর কিছু বল্‌তে হবে না ভজার মা, কি কর্‌বো, ওর জ্ঞাতি শত্রু। তা এবার দেখা যাবে।"

রায় মহাশয় তাড়াতাড়ি ভজার মার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন। ভজার মা মৃদু হাসিয়া বাজারের পথ ধরিল।

ইহার পর হইতে কাদম্বিনীর লক্ষ্মীপূজা মনসা পূজা কিছুই বাদ গেল না।

তারপর চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। কাদম্বিনীর হাতে কিছু জমিল। সে বন্ধক জিনিষপত্র রাখিয়া লোককে কিছু কিছু টাকা ধার দিত, সুদে আসলে টাকা বাড়িয়া উঠিত। এইরূপে বছরে বছরে একশত টাকা দুইশতে, দুইশত চারিশতে বাড়িয়া উঠিল। টাকা ধার দিবার বা আদায়ী টাকা তুলিবার সময় কাঠের সিন্দুক খুলিলে, যখন চক্‌চকে টাকাগুলা সম্মুখে হাসিতে থাকিত, তখন আনন্দ গর্ব্বে কাদম্বিনীর বুকটা

ফুলিয়া উঠিত। কিন্তু সিন্ধুক বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিলেই তাহার এ আনন্দটুকু-নিরানন্দে পরিণত হইত। টাকা তো জমিতেছে, কিন্তু এ টাকা ভোগ করিবে কে? যদি স্বামী থাকিত! স্বামী না থাক্, যদি সেই এক বছরের ছেলেটাও বাঁচিত! যদি একটা কাণা-খোঁড়া মেয়েও থাকিত! একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাদম্বিনী ভাবিত, "দূর হোক্, একা একা আর ভাল লাগে না। যদি একটা পরের ছেলেও পাই, মানুষ-মুনুষ ক'রে মনেরস াধ মিটাই।"

রায় ঠাকুর মাঝে মাঝে আসিয়া উপদেশ দিতেন, "কাদু, গাছ-প্রতিষ্ঠা কর। পরকালে সন্তানের কাজ কর্‌বে গাঁ.

রায় মহাশয় দোকানে দেবদারু কাঠের বাক্সের উপর বসিয়া বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠার অপূর্ব্ব ফলজনকত্ব বিষয়ে কত পৌরাণিক কাহিনী কীর্ত্তন করিতেন; কোন্ বৃক্ষপ্রতিষ্ঠাতা যমালয়ে ডোমের মেয়ের কাছে কুলার দাম না দেওয়ায় ঋণপাপে জড়িত হইয়া পড়িলে অশ্বত্থরূপী নারায়ণ কিরূপে আপনার বক্ষঃচর্ম্ম কাটিয়া দিয়া প্রতিষ্ঠাতাকে ঋণমুক্ত করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতেন। শুনিতে শুনিতে কাদম্বিনী মুগ্ধ হইয়া পড়িত। কিন্তু পরক্ষণেই যখন শূন্যগৃহের উপহাসপূর্ণ অট্টহাসি শুনিতে পাইত, তখন পরলোকের সুখের আশ্বাসে তাহার শূন্য হৃদয়টা কিছুতেই শান্ত হইত না, তাহার আগে ইহলোকেই হৃদয়ের এই শূন্যতা পূর্ণ করিবার জন্য প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিত। সে আকুলতার নিকট রায় মহাশয়ের ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণের মধুর উপদেশাবলী কঠোর বিদ্রূপের মতই প্রতীয়মান হইত।

মদন দাসও নিশ্চিন্ত ছিল না; সে মালা হাতে মধ্যে মধ্যে আসিয়া কাদীর দোকানে বসিত এবং পারলৌকিক পুণ্য সঞ্চয়ের প্রতিবাদ করিয়া বলিত, "পরকালের কথা পরে, ম'লে জলপিণ্ড দেবার লোক আগে

চাই। আর গাছপ্রতিষ্ঠা, দানধ্যান না করলেই কি পুণ্য হয় না? তার সোজা পথ প'ড়ে রয়েছে। শাস্ত্রে আছে, এক রাম নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে। হরিনাম কর। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। শুধু নাম, নাম ছাড়া কলিতে আর উপায় নাই।"

এইরূপে গদ্গদশ্রুলোচনে নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া পরম বৈষ্ণব মদন দাস স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্রটিকে পালকপুত্ররূপে যাহাতে কাদম্বিনী গ্রহণ করে, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিত। কাদম্বিনী কিন্তু কোন উত্তর দিত না। মদন দাস ক্ষুণ্ণচিত্তে গোবিন্দ মধুসূদনকে স্মরণ করিয়া ক্ষিপ্র অঙ্গুলীসঞ্চালনে মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রস্থান করিত। কাদম্বিনী কি করিবে, তাহাই ভাবিতে থাকিত।

শেষে কাদম্বিনী যখন আপনার মাসতুত ভাই গিরিশ নাগের স্ত্রীবিয়োগের সংবাদ পাইল, তখন সে ভজার মাকে সঙ্গে করিয়া ভায়ের বাড়ীতে গিয়া, গিরিশের আট বছরের ছেলে নবীনকে লইয়া আসিল। মদন দাসের ক্রোধ ও আক্ষেপের সীমা রহিল না, সে দুই বেলা স্বার্থ-পরায়ণা রমণীকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য হরির চরণে অভিযোগ করিতে লাগিল।

(৩)

"পিসী মা!"

"কেন রে, নবু?"

নবীন কাদম্বিনীকে পিসী মা বলিয়াই ডাকিত। কাদম্বিনীর ইচ্ছা ছিল, শুধু মা বলিয়াই ডাকে। ভজার মাও তাহাকে প্রথম প্রথম মা বলিয়া ডাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, নবীন কিন্তু সে অনুরোধ রাখিল না; উত্তরে বলিত, "দূর, এ যে পিসি মা। আমার মা তো ম'রে গেছে।"

বুদ্ধিমান্ নবীন পিসীমাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারিল না, পিসী-মা বলিয়াই ডাকিতে লাগিল। কাদম্বিনীকে অগত্যা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হইল। তবু তো সম্বোধনের শেষে মা কথাটা আছে।

নবীন ডাকিল, "পিসী মা!"

কাদম্বিনী বলিল, "কেন রে, নবু?"

নবীন। আমি আর পাঠশালে যাব না!

কাদ। কেন?

নবীন। গুরুমশায় যে মারে।

মৃদু হাসিয়া কাদম্বিনী বলিল, "গুরু মশায়ের মার না খেলে কি লেখা-পড়া হয় বাবা?"

জোরে মাথা নাড়িয়া নবীন বলিল, "নাই বা হ'লো। লেখাপড়া শিখে কি হবে?"

কাদ। পয়সা আন্‌তে পার্‌বি।

নবীন। আমার পয়সা আন্‌বার দরকার কি? তোমার তো পয়সা আছে।

কাদ। সে আর কত?

নবীন। পাঁচ সাতশো হবে তো?

কাদ। তা হ'তে পারে, কিন্তু তাতে কি হবে?

নবীন। তাতেই খুব হবে। ঐ পয়সায় আমি একটা দোকান কর্‌বো পিসী মা, খুব মস্ত দোকান হবে, তিন চার জন হালুইকর রেখে দেব। রোজ আট দশ টাকা বিক্রী হবে।

কাদম্বিনী হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তা তো কর্‌বি, কিন্তু লেখাপড়া না শিখলে দোকান চালাতে পারবি কেন?"

মস্তক সঞ্চালন করিয়া নবীন বলিল, "খুব পার্‌বো।"

কাদম্বিনী বলিল, "তা পারিস্ পারবি। এখন পাঠশালে যা।"

নবীন মুখ ভার করিয়া সরোদনে বলিল, "না, পাঠশালে গেলে আমি মরে যাব।"

কাদম্বিনী তাহার মাথায় হাত দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ষাট্ ষাট্, অমন কথা কি বল্‌তে আছে?"

হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে নবীন বলিল, "না, বল্‌তে নেই। গুরুমশায় এত মারে, তবু তুমি বল পাঠশালে যাও। তুমি পিসী কি না, মা হ'লে কি আমায় যেতে দিত?"

কাদম্বিনীর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইয়া স্তম্ভিত দৃষ্টিতে নবীনের মুখের দিকে চাহিল। নবীন পাতা দোয়াত ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইল।

হায় অবোধ শিশু, কি বুঝিবি তুই, কতখানি বুকভরা স্নেহ, প্রাণভরা আশা, হৃদয়ভরা আনন্দ লইয়া তোকে প্রতিপালন করিতেছে। তোর জন্য সে যে কত লোকের বিরাগভাজন হইয়াছে, কত পারলৌকিক সুখের আশা ত্যাগ করিয়াছে. আপনার নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনে কত চিন্তা, কত উদ্বেগ ডাকিয়া আনিয়াছে; তোর মুখের দিকে চাহিয়া সে শূন্য সংসারে কতখানি পূর্ণতা দেখিতে পাইয়াছে।

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাদম্বিনী ভাবিল, "ছেলে মানুষ!"

আর একদিন নবীন বলিল, "ও চাঁড়ালটা কেন আসে পিসী মা?"

"কে?"

"ঐ ভজা বেটা?"

"এলেই বা।"

সক্রোধে নবীন বলিল, "কেন আস্‌বে? ও ছোট লোক, চাঁড়াল।"

কাদম্বিনী বলিল, "ছি বাবা, ওরা অসময়ে কত উপকার করেছে।"

রাগে চীৎকার করিয়া নবীন বলিল, "করেছে করেছে, এখন আস্‌তে পাবে না।"

বিস্মিতভাবে কাদম্বিনী বলিল, "কেন বল্ দেখি।"

নবীন। কেন? ওর জন্য কত লোকে কত কথা বলে।

কাদম্বিনীর মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল; ধীরে ধীরে বলিল, "লোকের কথায় কাণ দিতে নাই।"

উত্তেজিত কণ্ঠে নবীন বলিল, "কাণ দিতে নাই তুমি দেবে না, আমি ও সব সইতে পার্‌ব না। তা হয় তো আমি বাবার কাছে চ'লে যাব।"

কাদম্বিনী নির্ব্বাক্ নিশ্চল। হায়, এ যে পরের ছেলে। এই ছেলেকে লইয়া সে আপনার পুত্রস্নেহের প্রবল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে চায়? ইহারই জন্য সে অশ্বথরূপী নারায়ণকেও পুত্রত্বে বরণ করিতে সম্মত হয় নাই? শুধু স্নেহের শিকলে—ভালবাসার প্রলোভনে সে কতক্ষণ এই বনের পাখীকে ধরিয়া রাখিবে? সে যে কথায় কথায় শিকলী কাটিতে চায়! নিজের ছেলে আর পরের ছেলেয় এত প্রভেদ!

তা হউক পরের ছেলে, সে যত পারে আঘাত করুক, তথাপি কাদম্বিনী তাহাকে ছাড়িতে পারিবে না। সে যে তাহার শূন্য বুকের অনেকখানি জুড়িয়া বসিয়াছে। কাদম্বিনী আপন মনে একটু হাসিল।

(৪)

মদন দাস রায় ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কি গো, রায় ঠাকুর, তোমার মাতব্বর যজমানের ছেলের বিয়ে যে।"

রায় ঠাকুর মুখ-বিকৃতি করিয়া বলিলেন, "রেখে দাও মাতব্বর যজমান। বেটী আগে দু'পয়সা দিচ্ছেল থুচ্ছেল বটে, কিন্তু ঐ ছেলেটাকে

নিয়ে অবধি আর কড়া ধুয়ে কড়ার জলটুকুর পর্য্যন্ত প্রত্যাশা নাই। ছেলেটা ওকে স্বর্গে দেবে। পঞ্চমীর ব্রত নিলে, তা আজ পর্য্যন্ত উদ্যাপন কর্‌লে না। বলে সময়টা বড় খারাপ। আরে বেটী, তোর সময় কি আর ভাল হবে? ছেলেটাও জুটেছে তেমনি।"

মাথা নাড়িয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে মদন দাস বলিল, "সকলই শ্রীহরির ইচ্ছা। আমি ব'লেছিলাম, আমার ছোট ছেলে কেষ্টধনকে নাও। তা পছন্দ হ'লো না। গোবিন্দ, গোবিন্দ।"

একটু থামিয়া মদন দাস পুনরায় বলিল, "তা বাবাঠাকুর, আমার তাতে কোনই ক্ষতি নাই, আমার সোণার চাঁদ সব বেঁচে থাকুক, কিন্তু তোমার জাতও গেল, পেটও ভর্‌ল না।"

ভ্রূকুটী করিয়া রায় ঠাকুর বলিলেন, "আমার জাত গেল কিসে? তোমরা কি ওকে বন্ধিত কর্‌তে পেরেছ? তোমাদের সে ক্ষমতা আছে কি? থাক্‌তো যদি জগন্নাথ দাদা বেঁচে।"—

বিরলকেশ মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে মদন সহাস্যে বলিল, "তিনি নাই, দর্পহারী মধুসূদন আছেন, তিনিই সব ব্যবস্থা কর্‌বেন। তা তোমরা যাও যাবে বাবাঠাকুর, আমি আর এ বয়সে চণ্ডালের অন্ন খেয়ে দেহটা অপবিত্র কর্‌তে পারব না।"

রায় ঠাকুর মুখটা একটু বাড়াইয়া দিয়া নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু গোলযোগ উঠেছে নাকি?"

অপাঙ্গে রায় ঠাকুরের দিকে চাহিয়া মদন দাস বলিল, "পাপ কখন আগুন চাপা থাকে না বাবাজী, তবে এখন চেপে যাও, দেখ, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। 'ভাঁয়োরে সাত তাল বয়' বুঝ্‌লে?"

যেন বুঝিয়াছে, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া রায় ঠাকুর মস্তক সঞ্চালন করিলেন। মদন দাস বারকতক পাপতাপহারী মধুসূদনকে ডাকিয়া লইল।

(৫)

নবীন ষোল বছরে পড়িতেই কাদম্বিনী তাহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। একটি ছোট বৌ ঘরে আসিবে, কাদম্বিনী মনের সাধ-আহ্লাদ মিটাইয়া তাহাকে খাওয়াইবে পরাইবে, ছেলে বৌ লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিবে, নবীনেরও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশমিত হইয়া আসিবে। কাদম্বিনী মেয়ে খুঁজিতে লাগিল।

অনেক খোঁজাখুজি, অনেক পছন্দ-অপছন্দের পর পৌনে তিন শত টাকা পণে একটি মেয়ে পাওয়া গেল। কাদম্বিনী বিবাহের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইল। বিবাহের সময় নবীনের বাপ গিরিশ নাগ আসিল, আরও দুই চারি জন আত্মীয় কুটুম্বকে আনা হইল। কাদম্বিনীর সুখ কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া আসিল। হায়, কে জানিত যে, সব হারাইয়া আবার এমন করিয়া সকল সুখই পাওয়া যাইবে? আনন্দে আত্মহারা হইয়া কাদম্বিনী দিন গণিতে লাগিল।

বিবাহের দিন নিকট হইল। গায়ে হলুদ হইয়া গেল। হলুদমাখা কাপড় পরিয়া জাঁতি হাতে হাসিমুখে নবীনকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া কাদম্বিনী আনন্দে চোখের জল চাপিতে পারিল না।

গাত্রহরিদ্রার আগে গিরিশ নাগ আসিয়া একটু গোল বাধাইয়াছিল। সে বলিল "কাদু, তোমার যা কিছু, সবই নবীনের। তা হ'লেও তোমার জ্ঞাতিরা তোমার ওয়ারিশ। বিয়ের আগে নবীনের নামে একটা কায়েমী লেখাপড়া ক'রে দাও। শরীরের ভালমন্দর কথা তো বলা যায় না।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া কাদম্বিনী ইহাতে সম্মত হইল। দানপত্র দ্বারা কাদম্বিনী আপনার ঘরবাড়ী, টাকাকড়ি, বন্ধকী গহনা প্রভৃতি সব নবীনের নামে লেখাপড়া করিয়া দিল। কোবালা রেজেষ্টারী হইয়া গেলে গাত্রহরিদ্রা হইল।

বিবাহের দিন সকালে কাদম্বিনী যখন নান্দীমুখের যোগাড় করিতে-ছিল, তখন মেয়ের বাড়ী হইতে একটি লোক আসিয়া জানাইল যে, মেয়ের বাপ সংবাদ পাইয়াছে, বরের প্রতিপালিকা পিসীর গ্রামে একটা অপবাদ আছে। পরগণার কাছে তাহার মীমাংসা না হইলে এ বাড়ীতে মেয়ে দেওয়া যায় না। নবীনকে মেয়ে দিতে আপত্তি নাই, কিন্তু কাদম্বিনী বাড়ীতে থাকিলে বিবাহ হইবে না M.

সংবাদ শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। গিরিশ নাগ মাথায় হাত দিয়া বসিল। মদন দাস আসিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। নবীন বলিল, "যদি বিয়ে না হয়, গলায় দড়ি দেব।"

অনেক আন্দোলন তর্কবিতর্ক হইল। শেষে স্থির হইল, বিবাহ বন্ধ হইতে পারে না; কাদম্বিনী দিন কতকের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া যাক্। নবীনের শুষ্ক মুখ প্রফুল্ল হইয়া আসিল। সে কাদম্বিনীকে বলিল, "তাই ভাল পিসীমা, তুমি দিন কতক কোথাও গিয়ে থাক।"

রুদ্ধশ্বাসে কাদম্বিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কোথায় থাক্‌ব ?

গিরিশ বলিল, "থাক্‌বার ভাবনা কি ? আমার বাড়ীতে না হয়, ঘোষপুরে আমার ভাগ্‌নে জামায়ের বাড়ীতে গিয়ে থাক।"

নবীন সোৎসাহে বলিল, "তাই যাও পিসীমা, সিন্দুকের চাবীটা দিয়ে যাও।"

কাদম্বিনী নবীনের প্রফুল্ল মুখখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আঁচল হইতে চাবীটা খুলিয়া দিল। উঠানে ভজার মা গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাদম্বিনী গিয়া তাহার হাত ধরিল; বলিল, "আয় ভজার মা।"

কাদম্বিনী ভজার মাকে টানিয়া বাহিরে আনিল। বাহিরে আসিয়া ভজার মা জিজ্ঞাসা করিল, "যাবি কোথায় ?" কাদম্বিনী থমকিয়া দাঁড়াইল; উদ্বিগ্নস্বরে বলিল, "তাই তো, কোথায় যাব বল্ দেখি।"

ভজার মা একটু হাসিয়া বলিল, "বিন্দাবনে চল্।"

কাদম্বিনী বলিল, "সেই ভাল, আয়।"

ভজার মাকে টানিয়া লইয়া কাদম্বিনী চলিয়া গেল।

* * *

মদন দাস বলিল, "ছিঃ বৌমা, চাঁড়ালের ঘরে থাকা কি ভাল দেখায়?"

ভজার কুঁড়ের দাবায় কাদম্বিনী বসিয়াছিল। ভাসুরকে দেখিয়া সে একটুও সঙ্কুচিত হইল না, মুখে ঘোমটা দিল না। সে দুই চোখ কপালে তুলিয়া ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "খুব ভাল দেখায়। এ চাঁড়ালের ঘর তোমাদের ঘরের চেয়ে পবিত্র।"

রায় ঠাকুরও মদনের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি আক্ষেপের স্বরে বলিলেন, "মাথা খারাপ হ'য়েছে। নইলে বলে চাঁড়ালের ঘর পবিত্র।"

ক্রোধে চীৎকার করিয়া কাদম্বিনী বলিল, "হাঁ, পবিত্র। আবার তোমাদের চেয়ে ভজা, ভজার মা পবিত্র। আমি ময়রা হ'তে চাই না, তোমাদের মত বামুন হ'তে চাই না, জন্ম জন্ম যেন ভজার মার মত চাঁড়ালের মেয়ে হই।"